তুষার-কণা

গ্রিমভাই

অনুবাদ

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি
কলেজ স্ট্রীট মার্কেট ॥ কলিকাতা-সাত

প্রথম প্রকাশ
আষাঢ় ২০, ১৩৭২

প্রকাশিকা
গীতা দত্ত
এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি
এ/১৩২, ১৩৩ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা-৭০০ ০০৭

মুদ্রাকর
মৃণাল দত্ত
একলা প্রিন্টিং প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
৭২/১ শিশির ভাদুড়ি সরণি
কলিকাতা-৭০০ ০০৬

অলঙ্করণ ও প্রচ্ছদ
গণেশ পাইন

প্রচ্ছদ লিপি
বিমল দাস

বাঁধাই
মহামায়া বাইণ্ডার্স
কলিকাতা-৭০০ ০০৬

সূচীপত্র

তুষার-কণা আর সাত বামনের গল্প

শীতকালের মাঝামাঝি একবার পাখির পালকের মতো তুষারের পাপড়ি ঝরছিল আকাশ থেকে আর এক রানী জানলার পাশে বসে কালো আবলুস কাঠের ফ্রেমের মধ্যে ছুঁচের কারুকাজ করছিল। কাজ করতে করতে বাইরেকার তুষারপাপড়ির দিকে তাকাতে ছুঁচটা তার আঙুলে ফুটে গেল আর তিন ফোঁটা রক্ত পড়ল তুষারের উপর। তুষারের উপর লাল রক্ত ভারি সুন্দর দেখাচ্ছিল বলে রানী মনে মনে বলল, 'তুষারের মতো সাদা আর রক্তের মতো টুকটুকে আর মাথায় এই আবলুস কাঠের মতো কালো চুল নিয়ে আমার একটি শিশু থাকলে খুব ভালো লাগত।'

তার অল্প কাল পরেই তার কোলে এল ছোট্টো একটি মেয়ে। মেয়েটির গায়ের রঙ তুষারের মতো ধবধবে আর রক্তের মতো টুকটুকে। মাথার চুল আবলুস কাঠের মতো কালো। আদর করে সবাই তাকে ডাকত 'তুষার-কণা' বলে। কিন্তু মেয়েটি জন্মাবার পরেই রানী মারা গেল।

বছর খানেকের মধ্যেই রাজা আবার বিয়ে করলেন। তাঁর দ্বিতীয় বউও খুব সুন্দরী। কিন্তু ভারি অহংকারী আর স্বভাবটাও অত্যন্ত উদ্ধত। তার চেয়ে বেশি সুন্দরী অন্য কাউকে সে বরদাস্ত করতে পারত না। তার ছিল একটা জাদুর আয়না। সেই আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের দিকে তাকিয়ে যখন সে প্রশ্ন করত:

"দেয়াল-আয়না দেয়াল-আয়না, না করে কোনো ভুল,
সবার সেরা সুন্দরী কোথায় আছে বল?"

আয়না উত্তর দিত, "রানী, তুমিই সব চেয়ে সুন্দরী।"

এটা শুনে সে তৃপ্তি পেত। কারণ জানত, আয়না সত্যি কথা বলে।

এদিকে তুষার-কণা বড়ো হয়ে উঠতে লাগল। আর যত দিন যেতে লাগল ততই রূপ যেন তার লাগল ফেটে পড়তে। যখন তার সাত বছর পূর্ণ হল তখন সে হয়ে উঠল সকালের মতো সুন্দর আর রানীর চেয়েও রূপসী।

একদিন রানী যখন যথারীতি আয়নাকে প্রশ্ন করেছে :

"দেয়াল-আয়না, দেয়াল-আয়না, না করে কোনো ছল,
সবার সেরা সুন্দরী কোথায় আছে বল ?"

আয়না উত্তর দিল :

"রানী তোমার রূপের কণা কেউ কখনো পায় নি,
তুষার-কণার রূপের জুড়ি দেখা কিন্তু যায় নি।"

উত্তর শুনে রানী রেগে ক্ষেপে উঠল। হিংসেয় একবার তার মুখ হল হলদে, একবার সবুজ। তার পর থেকে সেই ছোট্টো মেয়েটির দিকে তাকালেই মন তার নিষ্ঠুর হয়ে উঠত, ঘৃণায় ভরে যেত বুক। দিনে রাতে তার শান্তি রইল না। সব সময় হিংসেয় জ্বলেপুড়ে মরে। একদিন এক শিকারীকে ডেকে পাঠিয়ে সে বলল, "এই বাচ্চা মেয়েটাকে বনে নিয়ে যাও। এ আমার দু চক্ষের বিষ হয়ে উঠেছে। একে মেরে ফেলে প্রমাণ হিসেবে এর কলজে আর ফুসফুস আমাকে এনে দেখাবে।"

রানীর আদেশমতো তুষার-কণাকে নিয়ে গেল শিকারী। বর্শা তুলে তার নিষ্পাপ বুকে সেটা যখন সে বিঁধতে যাচ্ছে কেঁদে ফেলে অনুনয় করে মেয়েটি তাকে বলল :

"শিকারী-ভাই, আমাকে মেরো না। বনের মধ্যে অনেক দূরে আমি চলে যাব। কক্ষনো আর ফিরব না।" তার সুন্দর মুখের দিকে তাকিয়ে শিকারীর মায়া হল। সে বলল, "বেশ, দৌড়ে পালাও।"

শিকারী ভাবল, 'বুনো জন্তু নিশ্চয়ই ওকে খেয়ে ফেলবে। তাই আমার মারা না-মারা—দুইই সমান।' কিন্তু নিজের হাতে তাকে না মারার জন্য শিকারীর মনে হল—বুক থেকে যেন পাথরের ভারী একটা বোঝা নেমে গেছে। ঠিক তখুনি পাশ দিয়ে একটা হরিণ-ছানা ছুটে যাচ্ছিল। সেটাকে মেরে তার কলজে আর ফুসফুস নিয়ে গিয়ে রানীকে সে দেখাল। রাঁধুনি সেগুলো নুনে জরিয়ে রাঁধল আর সেই

শয়তান রানী সেগুলো খেয়ে ভাবল তুষার-কণার কলজে আর ফুসফুস খেয়েছে।

এদিকে বেচারা মেয়েটি একলা ঘুরে বেড়াতে লাগল সেই বিরাট বনের মধ্যে। প্রতিটি পাতার আড়াল থেকে সে উঁকি মেরে দেখে কেউ সেখানে আছে কি না। শেষটায় সে ছুটতে শুরু করল তীক্ষ্ণ পাথরের উপর দিয়ে, কাঁটাঝোপের ভিতর দিয়ে। বুনো জন্তু-জানোয়ার তাকে দেখেও দেখল না। সমস্ত দিন ছুটে-ছুটে সন্ধেয় সে পৌঁছল ছোট্টো একটি বাড়ির কাছে। বিশ্রাম নেবার জন্য বাড়িটার মধ্যে সে গেল। ভিতরে গিয়ে সে দেখে সব-কিছু পরিষ্কার পরিপাটি করে সাজানো। সেখানে ছিল ছোট্টো একটা টেবিল। তার উপর ধবধবে সাদা টেবিল ঢাকা আর ছোট্টো-ছোট্টো সাতটা প্লেট। প্রত্যেকটি প্লেটের পাশে ছোট্টো-ছোট্টো ছুরি, কাঁটা আর চামচে। আর ছিল সাতটা ছোট্টো-ছোট্টো গেলাস। দেওয়ালের পাশে বিছানা পাতা ছোট্টো-ছোট্টো সাতটা খাট। তুষার-কণার খুব খিদে পেয়েছিল। তাই প্রত্যেকটা প্লেট থেকে একটু-একটু করে রুটি আর মাংস সে খেল। আর প্রত্যেকটি গেলাসে দিল একটু করে চুমুক। তার পর খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল বলে সে গেল শুতে। প্রত্যেকটা বিছানায় শুয়ে-শুয়ে সে দেখল—কোনোটা তার পক্ষে খুব ছোটো, কোনোটা তার পক্ষে খুব বড়ো। কিন্তু সপ্তম বিছানায় শুয়ে সে দেখল সেটা ঠিক তার মাপসই। সেটায় শুয়ে, ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানিয়ে সে পড়ল ঘুমিয়ে।

অন্ধকার গভীর হবার পর সেই ছোট্টো বাড়ির কর্তারা ফিরল। তারা সাতটি বামন, পাহাড়ে গিয়েছিল সেখান থেকে খুঁড়ে ধাতু আনতে। তারা তাদের ছোট্টো-ছোট্টো সাতটা মোমবাতি জ্বালাল। বাড়িটার মধ্যে আলো হতে তারা দেখে—কেউ সেখানে এসেছিল, জিনিসপত্র যেভাবে সাজিয়ে-গুছিয়ে রেখে তারা গিয়েছিল সেগুলো আর তেমনটি নেই। প্রথম বামন বলল, "কে আরাম কেদারায় বসেছিল?" দ্বিতীয় বলল, "কে আমার ছোট্টো প্লেট থেকে খেয়েছে?" তৃতীয় বলল, "কে আমার রুটি ভেঙেছে?" চতুর্থ বলল, "কে আমার তরকারি খেয়েছে?" পঞ্চম বলল, "কে আমার কাঁটা নোংরা করেছে?" ষষ্ঠ বলল, "কে আমার ছুরি দিয়ে খেয়েছে?" সপ্তম বলল, "কে আমার গেলাসে চুমুক দিয়েছে?"

তার পর প্রথম বামন পিছনে তাকিয়ে দেখে তার বিছানায় টোল পড়েছে। সে চেঁচিয়ে উঠল, "কেউ আমার বিছানায় শুয়েছিল।" তাই

শুনে আর সবাইও নিজের নিজের বিছানার কাছে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, "আমার বিছানাতেও কেউ শুয়েছিল। আমার বিছানাতেও কেউ শুয়েছিল!" কিন্তু সপ্তম বামন নিজের বিছানার কাছে গিয়ে সেখানে দেখে পরম তৃপ্তির সঙ্গে ঘুমিয়ে রয়েছে তুষার-কণা। আর সবাইকে সে ডাকল। তারা এসে ঘুমন্ত মেয়েটিকে ভালো করে দেখার জন্যে তুলে ধরল নিজের-নিজের মোমবাতি। মেয়েটির অদ্ভুত রূপ দেখে প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে তারা চেঁচিয়ে উঠল, "কী আশ্চর্য। এরকম রূপ তো দেখা যায় না!" ভারি খুশি হয়ে উঠল তারা। সবাই স্থির করল—তাকে জাগাবে না, যেখানে শুয়ে সেখানেই সে ঘুমুক। সপ্তম বামন পালা করে তার বন্ধুদের বিছানায় শুলো। ঘণ্টায়-ঘণ্টায় সে করল বিছানা বদল। এইভাবে সকাল হল।

ভোরে তুষার-কণার ঘুম ভাঙল। বামনদের দেখে সে পেল খুব ভয়। কিন্তু বামনরা ছিল দয়ালু আর তাদের স্বভাবটা মিষ্টি। তারা প্রশ্ন করল, "তোমার নাম কী?"

মেয়েটি বলল, "আমার নাম তুষার-কণা।"

"এখানে এলে কী করে?" আবার তারা প্রশ্ন করল।

তুষার-কণা তাদের বলল সব কথা—কী ভাবে সৎমা তাকে মেরে ফেলার আদেশ দিয়েছিল, কীভাবে শিকারী তাকে পালাতে দেয় আর কী ভাবে সমস্ত দিন ছুটতে-ছুটতে সে পৌঁছয় তাদের ছোট্টো বাড়িতে।

তার কথা শুনে বামনরা বলল, "আমাদের হয়ে যদি তুমি ঘর-সংসার দেখ, রাঁধোবাড়ো, বিছানা পাত, কাপড় কাচ, সেলাই-ফোঁড়াই কর, আর সব কিছু যদি পরিষ্কার পরিপাটি করে রাখ—তা হলে আমাদের সঙ্গে থাকতে পাবে, কোনো কিছুর অভাব হবে না।"

তুষার-কণা বলল, "তোমরা যা বলবে সব-কিছু খুব খুশি হয়েই করব!" এইভাবে মেয়েটি থেকে গেল তাদের সঙ্গে। তাদের হয়ে সে ঘর-সংসার দেখে আর তারা পাহাড়ে যায় সোনা আর তামার খোঁজে। প্রতি সন্ধেয় বাড়ি ফিরলে সে তাদের পরিবেশন করে রাতের খাবার। কিন্তু সারাদিন ছোট্টো মেয়েটি একা থাকে বলে বিজ্ঞ বামনরা তাকে বলল, "তোমার সৎমা সম্বন্ধে সাবধান। খুব সম্ভব শিগ্‌গিরই সে জানতে পারবে তুমি এখানে আছ। তাই কাউকে বাড়ির মধ্যে আসতে দিয়ো না।"

তুষার-কণার কলজে আর ফুসফুস খেয়েছে বলে মনে করে রানী ভাবল, এবার নিশ্চয়ই পৃথিবীর মধ্যে সে শ্রেষ্ঠ সুন্দরী। তাই তার আয়নার কাছে গিয়ে সে প্রশ্ন করল :

"দেয়াল-আয়না, দেয়াল-আয়না, না করে কোনো ছল,
সবার সেরা সুন্দরী কোথায় আছে বল ?"

আয়না উত্তর দিল :

"সবার সেরা সুন্দরী রানী তুমি এখানে,
পাহাড়ের অন্য পারে
সাত বামনের সংসারে
লক্ষগুণ রূপবতী তুষার-কণা সেখানে।"

আয়নার কথা শুনে রাগে রানী থর্‌থর্‌ করে কাঁপতে লাগল। কারণ সে জানত আয়না তাকে সত্যি কথাই বলেছে। সে বুঝল শিকারী তাকে ঠকিয়েছে আর তুষার-কণা আছে বেঁচে। রানীর মাথায় তখন শুধু একমাত্র চিন্তা—কী করে তুষার-কণাকে মেরে ফেলা যায়। কারণ পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে সুন্দরী হতে না পারলে হিংসেয় জ্বলে-পুড়ে খাক হয়ে যাবে। শেষটায় তার মাথায় একটা ফন্দি এল। হাতে-মুখে কালিঝুলি মেখে সে এমন ভাবে বুড়ি ফেরিওয়ালার পোশাক পরল যে, তাকে চেনা অসম্ভব। এই ছদ্মবেশে হেঁটে পাহাড় পেরিয়ে সে পৌঁছল সাত বামনের আস্তানায়। তার পর দরজায় টোকা দিয়ে হাঁক দিল, "আমার সওদাগুলো খুব সস্তা—কেউ কিনবে ?"

জানলার পর্দার ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে তুষার-কণা বলল, "শুভদিন, বুড়িমা। কী—কী জিনিস আছে ?"

রানী বলল, "হরেকরকম সুন্দর-সুন্দর ভালো-ভালো জিনিস, বাছা : লেস, রঙিন জামা, এই দেখ।" এই-না বলে সিল্কের লেসের চোখ-ধাঁধানো রঙের একটা জামা সে বার করল।

তুষার-কণা ভাবল, 'এই ভালোমানুষ বুড়ি বাড়ির মধ্যে এলে কোনো ক্ষতি নেই।' তাই দরজা খুলে সে কিনল সুন্দর দুটো লেসের জামা।

বড়ি বলল, "বাছা, তোর মুখটা ভারি সরল। এখানে আয়, লেসের জামাটা তোকে ভালো করে পরিয়ে দি।"

তুষার-কণা কোনোরকম সন্দেহ করল না। লেসের জামাটা পরবার জন্য বুড়ির কাছে গিয়ে সে দাঁড়াল। বুড়ি চট্‌পট্‌ এমন আঁট করে লেস

জড়িয়ে দিল যে, মেয়েটি ভালো করে নিশ্বেস নিতে পারল না। শেষটায় পড়ে গেল, যেন মরে গেছে। "আর তুই সব চেয়ে সুন্দরী নোস," বলে চট্‌পট রানী চলে গেল।

সন্ধ্যেয় বামনরা ফিরে তুষার-কণাকে মেঝেয় পড়ে থাকতে দেখে খুব ভয় পেয়ে গেল। সে নড়েও না, কথাও বলে না। দেখে মনে হয় মরে গেছে। তাকে তুলে তারা দেখল তার গায়ে খুব আঁট করে লেস জড়ানো হয়েছে। চট্‌পট্ তারা লেসের জামাটা কেটে ফেলতে তুষার-কণা নি:শ্বস নিতে শুরু করল তার পর ধীরে-ধীরে ফিরে এল তার জ্ঞান। সব কথা শুনে বামনেরা বলল, "বুড়ি ফেরিওয়ালি আর কেউ নয়—শয়তান রানী এসেছিল ছদ্মবেশে। ভবিষ্যতে সাবধানে থেকো। আমরা বাইরে গেলে কাউকে বাড়ির মধ্যে আসতে দিয়ো না।"

বাড়ি ফিরেই শয়তান রানী তার আয়নার কাছে গিয়ে প্রশ্ন করল :

"দেয়াল-আয়না, দেয়াল-আয়না, না করে কোনো ছল,
সবার সেরা সুন্দরী কোথায় আছে বল ?"

আগের মতোই আয়না উত্তর দিল।

"সব সেরা সুন্দরী রানী তুমি এখানে
পাহাড়ের অন্য পারে
সাত বামনের সংসারে
লক্ষগুণ রূপবতী তুষার-কণা সেখানে।"

কথাটা শুনতেই দারুণ রাগে মুখ তার ফ্যাকাশে হয়ে গেল। কারণ সে বুঝল তুষার-কণা বেঁচে আছে! তার পর আপন মনে বলে উঠল, 'যাক গে, এবার আরো ভালো করে ফান্দ আঁটব।' রানী জানত অনেক তুকতাক আর ডাইনিদের জাদুমন্ত্র। তাই সে বানাল একটা চিরুনি। তার পর আবার এক বুড়ির ছদ্মবেশ ধরে পাহাড় পেরিয়ে গিয়ে সেই বামনদের বাড়ির দরজায় টোকা দিল।

"কে আমার সওদা কিনবে? খুব সস্তা," হাঁক দিল সে।

তুষার-কণা উঁকি দিয়ে মুখ বার করে বলল, "তুমি যাও। কাউকে আমি ভিতরে আসতে দেবো না।"

জানলার দিকে সেই বিষাক্ত চিরুনিটা তুলে ধরে বুড়ি বলল, "এই সুন্দর চিরুনিটা একবার দেখো।"

ছেলেমানুষ তুষার-কণার চিরুনিটা খুব পছন্দ হল। সেটা কেনার জন্য বুড়িকে সে আসতে দিল।

বুড়ি বলল, "আয় বাছা, তোর চুল ভালো করে আঁচড়ে দি।"

তুষার-কণার কোনোরকম সন্দেহ হল না। বুড়িকে তার চুল আঁচড়াতে দিল। আর চিরুনিটা তার চুলে ঠেকতে-না-ঠেকতে অজ্ঞান হয়ে সে ঢলে পড়ল মেঝের উপর।

বিড়্‌বিড়্‌ করে বুড়ি বলল, "এইবার তোর রূপের দফা শেষ।" এই-না বলে চট্‌পট্‌ সে সরে পড়ল।

মেয়েটির কপাল ভালো। কারণ তখন সন্ধে ঘনিয়ে এসেছে। বাড়ি ফেরার সময় হয়েছে বামনদের। মেঝেয় জ্ঞান হারিয়ে তুষার-কণাকে পড়ে থাকতে দেখে সঙ্গে সঙ্গে তাদের সন্দেহ হল—সৎমা আবার এসেছিল। তার পর তাদের চোখে পড়ল বিষাক্ত চিরুনিটা। চুল থেকে সেটা তারা বার করে নিতেই তুষার-কণার জ্ঞান এল। আর তার পর সে জানাল সব কথা। তার বামন বন্ধুরা আবার তাকে সাবধান করে দিল—তারা না থাকলে কখনো সে যেন দরজা না খোলে।

বাড়ি পৌঁছে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে রানী প্রশ্ন করল :

"দেয়াল-আয়না, দেয়াল-আয়না, না করে কোনো ছল,
সবার সেরা সুন্দরী কোথায় আছে বল ?"

আগের মতোই আয়না উত্তর দিল :

"সব সেরা সুন্দরী রানী তুমি এখানে
পাহাড়ের অন্য পারে
সাত বামনের সংসারে
লক্ষগুণ রূপবতী তুষার-কণা সেখানে।"

আয়নার কথাগুলো শোনার সঙ্গে সঙ্গে রানী আবার রাগে থর্‌থর্‌ করে কাঁপতে লাগল। সে চেঁচিয়ে উঠল, "তুষার-কণাকে মরতেই হবে। তার জন্যে যদি আমার জীবন যায় তো যাক।" তার পর একটা চিলে-কোঠায় গিয়ে সে দরজা বন্ধ করে দিল, যেখানে কেউ যায় না। আর তার পর বানাল একটা আপেল, যেটা কালকূট বিষ। বাইরে থেকে সেটা দেখতে ভারি সুন্দর—লাল টুকটুকে। দেখলেই কামড় বসাতে লোভ হয়। কিন্তু সেটার ছোট্টো একটা টুকরো মুখে গেলেই নিশ্চিত মৃত্যু। আপেল বানিয়ে মুখে রঙ করে সে ধরল চাষী-বউয়ের

ছদ্মবেশ। আর তার পর পাহাড় পেরিয়ে পৌঁছল সেই সাত বামনের বাড়ি। দরজায় টোকা দিতে জানলা দিয়ে মাথা বার ক'রে তুষার-কণা চেঁচিয়ে উঠল :

"কাউকে ভেতরে আসতে দেওয়া বারণ। সাত বামন আমাকে নিষেধ করে দিয়েছে।"

চাষী-বউ বলল, "দরজা খোলার দরকার নেই। আমি শুধু আমার আপেলগুলো বিলিয়ে দিতে চাই। এই নে, এই আপেলটা তোকে দিলাম।"

তুষার-কণা বলল, "না, ধন্যবাদ। কিছু নেওয়া আমার বারণ।"

চাষী-বউ বলল, "বিষের ভয় করছিস? এই দেখ—এটা আমি দু টুকরো করে কাটলাম। তুই ডান-দিকটা খা, আমি খাচ্ছি বাঁ-দিকটা।"

আপেলটা এমন নিপুণ ভাবে তৈরি করা হয়েছিল যে, শুধু সেটার ডান দিকেই ছিল বিষ। টুকটুকে আপেলটা চোখে দেখার লোভ তুষার-কণা সামলাতে পারল না। চাষী বউকে সেটা খেতে দেখে হাত বাড়িয়ে সে নিল বিষাক্ত দিকটা। আর যেই-না তাতে কামড় দেওয়া—সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে মরে পড়ল লুটিয়ে। নিষ্ঠুর চোখে তার দিকে তাকিয়ে হো-হো করে হেসে উঠল রানী। তার পর বলল :

"তুষারের মতো ধবধবে, রক্তের মতো টুকটুকে গায়ের রঙ আর আবলুস কাঠের মতো কালো চুল! হো-হো-হো! বামনেরা এবার আর তোকে জাগাতে পারবে না।" বাড়ি ফিরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সে প্রশ্ন করল :

"দেয়াল-আয়না, দেয়াল-আয়না, না করে কোনো ছল,
সবার সেরা সুন্দরী কোথায় আছে বল?"
শেষটায় আয়না উত্তর দিল :
"তুমিই রানী সব সেরা সুন্দরী।"

রানীর হিংসুটে হৃদয় তখন হল শান্ত—মানে হিংসুটে হৃদয় যতটা শান্ত হতে পারে, ততটা।

সেই সন্ধেয় বামনরা বাড়ি ফিরে দেখে তাদের তুষার-কণা মাটিতে লুটিয়ে পড়ে, নিশ্বেস পড়ছে না, একেবারে মরে গেছে। তাকে তুলে সর্বত্র তারা বিষের চিহ্ন খুঁজল—তার লেসের জামা ছাড়াল, চুল আঁচড়ে দিল, মুখে জল ছিটল, খানিকটা জল গলার মধ্যে ঢালল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। তাদের আদরের শিশু মরে গিয়েছিল, সে আর

বেঁচে উঠল না। তাকে একটি শবাধারে শুইয়ে তার চার পাশে উবু হয়ে বসে সেই সাতটি বামন কাঁদল তিনদিন ধরে। তার পর তারা চাইল তাকে কবর দিতে। কিন্তু তখনো মেয়েটির চেহারা তাজা আর জীবন্ত, তখনো তার গাল দুটি টুকটুকে লাল। তাই নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে তারা বলাবলি করল, "এত সুন্দর মেয়েকে কালো মাটির নীচে আমরা কবর দিতে পারব না। স্বচ্ছ কাঁচের কফিন বানিয়ে তার মধ্যে একে আমরা শোয়াব, যাতে চার দিক থেকেই দেখা যায়। কফিনের ডালায় সোনার অক্ষরে আমরা লিখে দেব এর নাম আর মেয়েটি যে রাজকন্যে ছিল সেই কথা। তার পর কফিনটিকে রাখব আমরা পাহাড়ের ওপর আর পালা করে এই কফিন আমরা দেব পাহারা।" এই বলে কফিনটিকে তারা রাখল পাহাড়ের উপর আর পাখির দল এল তুষার-কণার জন্যে কাঁদতে—প্রথমে এক পেঁচা, তার পর এক দাঁড়কাক আর সবশেষে এক পায়রা।

অনেক অনেক দিন ধরে তুষার-কণা শুয়ে রইল সেই কফিনে। তার চেহারা এতটুকু বদলাল না। তাকে দেখে মনে হয় সে ঘুমিয়ে রয়েছে। তখনো সে তুষারের মতো ধবধবে, রক্তের মতো টুকটুকে আর তার মাথার চুল আবলুস কাঠের মতো কালো।

তার পর হল কি, একদিন এক রাজপুত্তুর সেই বনে এসে বামনদের বাড়িতে রাতের জন্য আশ্রয় নিল। পাহাড়ের উপর কফিনের মধ্যে রূপসী তুষার-কণাকে শুয়ে থাকতে সে দেখেছিল আর পড়েছিল সোনার অক্ষরের সেই লেখাগুলো। বামনদের সে বলল, "কফিনটা আমায় দাও। তার জন্যে যত মোহর তোমরা চাও আমি দেব।"

বামনরা কিন্তু উত্তর দিল, "পৃথিবীর সব সোনা দিলেও কফিনটি আমরা দেব না।"

রাজপুত্তুর বলল, "তা হলে বিনা-পয়সায় কফিনটি আমায় দাও। তুষার-কণাকে না দেখে আমি বাঁচতে পারব না। তোমাদের কথা দিচ্ছি তাকে আমি খুব যত্নে আর সাবধানে রাখব—পৃথিবীতে তার চেয়ে প্রিয় আমার আর কিছু নেই।" এই আন্তরিক কথাগুলো শুনে রাজপুত্তুরের উপর বামনদের খুব মায়া হল। তাই কাচের কফিনটা তারা তাকে দিল উপহার। ভৃত্যদের কাঁধে চাপিয়ে সেই কফিন রাজ-পুত্তুর নিয়ে গেল।

এখন হল কি, যেতে যেতে ভৃত্যরা এক মেঠো লতায় পড়ল হুমড়ি খেয়ে। আর সেই ঝাঁকানিতে বিষাক্ত আপেলের যে-টুকরোটা তুষার-কণা কামড়ে ছিল সেটা বেরিয়ে গেল তার গলা থেকে। তার এক মিনিট পরে সে চোখ মেলে তাকাল। আর তার পর কফিনের ডালা তুলে উঠে বসে চেঁচিয়ে উঠল, "আমি কোথায় ?"

তাই-না দেখে রাজপুত্তুরের আনন্দ আর ধরে না। সে বলল, "তুমি আছ আমার সঙ্গে" আর তার পর জানাল বামনদের কাছ থেকে কফিনটা কী ভাবে পেয়েছিল সে। রাজপুত্তুর বলে চলল, "পৃথিবীতে তোমার চেয়ে বেশি কাউকে আমি ভালোবাসি না। আমার সঙ্গে আমার বাবার প্রাসাদে চল—তোমাকে আমি বিয়ে করব।"

রাজপুত্তুরের সঙ্গে যেতে তুষার-কণা মোটেই আপত্তি করল না। আর তার পর তাদের বিয়ে হয়ে গেল খুব ধুমধাম করে।

সেই বিয়েতে নেমন্তন্ন করা হয়েছিল তুষার-কণার শয়তান সৎমাকে। বিয়ে বাড়িতে যাবার নতুন পোশাক আর হীরে-জহরতের গয়নাগাটি পরে সে যখন তার আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করল :

"দেয়াল-আয়না, দেয়াল-আয়না, না করে কোনো ছল,
সবার সেরা সুন্দরী কোথায় আছে বল ?"

আয়না তখন উত্তর দিল :

"সব সেরা সুন্দরী রানী তুমি এখানে,
লক্ষগুণ রূপবতী নতুন রানী সেখানে।"

কথাগুলো শুনে শয়তান রানী চীৎকার করে অভিশাপ দিয়ে উঠল। উত্তেজনায় উৎকণ্ঠায় কী যে করবে ভেবে পেল না।

প্রথমে সে বলল বিয়ে বাড়িতে সে যাবে না ; কিন্তু যে তরুণী রানীর রূপ তার চেয়ে লক্ষগুণ বেশি তাকে দেখবার অসম্ভব কৌতূহল সে দমন করতে পারল না। তাই সে গেল, আর সেই রাজপ্রাসাদে পা দিয়েই সে চিনতে পারল তুষার-কণাকে। আতঙ্কে বিস্ময়ে স্থির হয়ে সেখানে সে দাঁড়িয়ে পড়ল। তার জন্য লোহার একজোড়া চটি চুল্লিতে গন্‌গনে গরম করা হয়েছিল। সাঁড়াশি করে সেগুলো আনা হল। আর তার পর সেই গন্‌গনে লাল চটি জোড়া পরিয়ে যতক্ষণ না মরে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে ততক্ষণ তাকে বাধ্য করা হল নাচতে।

সাপের তিনটি পাতা

এক সময় ছিল গরিব একটি লোক। এমন গরিব যে নিজের একমাত্র ছেলেকে মানুষ করার সঙ্গতি তার ছিল না। তাই ছেলে তাকে বলল, "বাবা, তোমার অবস্থা এতই খারাপ যে আমি তোমার কাছে একটা বোঝার মতো। বেরিয়ে পড়ে দেখি, নিজের রুটি নিজে রোজগার করতে পারি কি পারি না।" বাবা তাকে আশীর্বাদ করে মনের দুঃখে বিদায় দিল।

সে-সময় এক শক্তিশালী এলাকার রাজা যুদ্ধ করছিল। সেই তরুণ তাঁর সৈন্যদলে যোগ দিয়ে চলে গেল যুদ্ধ করতে। শত্রুর সেনা দারুণ লড়তে লাগল। সেই তরুণ আর তার দলের সৈন্যদের উপর বৃষ্টির মতো নীল বুলেট লাগল ঝরতে। তার দলের অনেকেই গেল মারা। অন্যরা চাইল পালাতে। কিন্তু সেই তরুণ এগিয়ে গিয়ে বলল, "ভয় পেয়ে কাপুরুষের মতো পালিয়ো না। আমাদের পিতৃভূমিকে কিছুতেই

আমরা ছেড়ে যাব না।" তার কথা শুনে তারা আবার যুদ্ধ করতে ফিরে গেল আর ফিরে গিয়ে নিঃশেষ করে দিল শত্রু-সেনা। সেই তরুণের জন্য জয়ী হয়েছেন শুনে রাজা তাকে প্রধান অফিসার করলেন, দিলেন অনেক ধনসম্পত্তি আর করলেন তাকে নিজের প্রধান উপদেষ্টা।

রাজার ছিল একটি মেয়ে। যেমন রূপসী তেমনি খামখেয়ালী। সে পণ করেছিল এমন কাউকে বিয়ে করবে যাকে প্রথমে অঙ্গীকার করতে হবে সে মারা গেলে একই কবরে তার সঙ্গে সে যাবে জীবন্ত অবস্থায়। রাজকন্যে বলেছিল, "আমাকে সত্যিকারের ভালোবাসলে আমি মরবার পর আমার স্বামী আর বেঁচে থাকতে চাইবে না।" এ কথাও সে বলেছিল—স্বামী আগে মারা গেলে তার সঙ্গে সে-ও জীবন্ত অবস্থায় যাবে কবরে।

এই অদ্ভুত পণের জন্য কেউই তাকে বিয়ে করতে সাহস করে নি। কিন্তু তার রূপে সেই তরুণ এমনই মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল যে, রাজকন্যের পণ শুনে সে ভয় পেল না। তাই রাজাকে গিয়ে সে বলল, রাজকন্যেকে বিয়ে করতে সে রাজি।

রাজা প্রশ্ন করলেন, "তোমাকে কী প্রতিজ্ঞা করতে হবে জান তো?"

সে বলল, "জানি—রাজকন্যে আগে মারা গেলে তার সঙ্গে আমায় কবরে যেতে হবে। কিন্তু তাকে আমি এতই ভালোবেসে ফেলেছি যে, সেই সর্তেই রাজি।" রাজা তাই বিয়েতে মত দিলেন। আর খুব ধুমধাম করে তাদের বিয়ে হয়ে গেল। কিছুকাল তারা খুব আনন্দেই কাটাল। তার পর হঠাৎ একদিন রাজকন্যে পড়ল ভয়ংকর অসুখে। কোনো রাজবদ্যিই তার অসুখ সারাতে পারল না। রাজকন্যে মারা যেতে সেই তরুণের মনে পড়ল নিজের প্রতিজ্ঞার কথা। রাজকন্যের সঙ্গে জীবন্ত অবস্থায় কবরে যাবার কল্পনায় আতঙ্কে সে শিউরে উঠল। কিন্তু পালাবার কোনো পথ নেই। কারণ যাতে সে পালাতে না পারে তার জন্য বুড়ো রাজা শহর থেকে বেরুবার পথে পাহারা বসিয়ে দিয়েছিলেন। রাজকন্যের মৃতদেহের সঙ্গে সেই তরুণকেও রাজ-সমাধিকক্ষে নামিয়ে দরজায় কুলুপ এঁটে দেওয়া হল। কফিনের কাছে একটা টেবিলের উপর রাখা ছিল চারটে বড়ো-বড়ো মগে জল, চারটে পাউরুটি আর চার বোতল মদ। সেই খাদ্য আর পানীয় শেষ হলেই তাকে উপোস করে মরতে হবে। খুব মনমরা হয়ে সে বসে থাকে। প্রতিদিন খায় রুটির

ছোট্টো টুকরো আর সামান্য মদ। আর বুঝতে পারে মৃত্যু গুটিগুটি আসছে তার দিকে এগিয়ে।

মনমরা হয়ে একদিন মেঝের দিকে তাকিয়ে আছে, এমন সময় দেখে সেই সমাধিঘরের এক কোণ থেকে নিঃশব্দে একটা সাপকে বেরিয়ে এসে রাজকন্যের মৃতদেহের দিকে এগিয়ে যেতে। সে ভাবল সাপটা সম্ভবত এসেছে রাজকন্যের মৃতদেহটা খেতে। তাই খাপ থেকে তরোয়াল বার করে সে বলে উঠল, "যতক্ষণ আমি বেঁচে ততক্ষণ রাজকন্যের দেহ কেউ স্পর্শ করতে পারবে না।" এই-না বলে সঙ্গে সঙ্গে সাপটাকে সে তিন টুকরো করে দিল।

খানিক পরে সেই কোণ থেকে বেরিয়ে এল আর-একটা সাপ। কিন্তু অন্য সাপটাকে টুকরো-টুকরো হয়ে মরে পড়ে থাকতে দেখে দ্বিতীয় সাপটা পালিয়ে গেল। খানিক বাদেই ফিরল মুখে তিনটি সবুজ পাতা নিয়ে। তার পর মরা সাপের তিনটে টুকরো জুড়ে দ্বিতীয় সাপটা প্রত্যেকটা জোড়ের মুখে রাখল একটা করে সবুজ পাতা। আর সঙ্গে সঙ্গে কাটা সাপটা জোড়া লেগে বেঁচে উঠল আর তার পরেই সাপ দুটো গেল পালিয়ে। কিন্তু যাবার সময় মেঝেয় তারা ফেলে গেল সেই সবুজ তিনটে পাতা।

সমস্ত ব্যাপারটা লক্ষ্য করে সেই তরুণের মনে হল—মরা সাপকে বাঁচাবার আশ্চর্য ক্ষমতা পাতা তিনটের থাকলে হয়তো মরা মানুষকেও এগুলো বাঁচাতে পারে। তাই সেগুলো কুড়িয়ে নিয়ে একটা রাখল রাজকন্যের মুখে আর অন্য দুটো তার দু চোখে। আর কী আশ্চর্য! প্রায় সঙ্গে সঙ্গে রাজকন্যের শিরায় শিরায় বইতে শুরু করল রক্ত আর তার ফ্যাকাশে মুখটা হয়ে উঠল গোলাপী। তার পর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে চোখ মেলে তাকিয়ে অবাক হয়ে রাজকন্যে চেঁচিয়ে উঠল :

"হা ভগবান! এ আমি কোথায়?"

তার স্বামী বলল, "বউ, তুমি আমার কাছে রয়েছ।" তার পর জানাল কী করে তাকে সে বাঁচিয়ে তুলেছে। রাজকন্যেকে সে খেতে দিল রুটি আর মদ। রাজকন্যে সুস্থ হয়ে উঠলে দুজনে তারা গিয়ে দরজায় দিতে লাগল ধাক্কা আর চেঁচিয়ে শুরু করে দিল ডাকাডাকি করতে। তাই-না শুনে প্রহরীর দল ছুটে গিয়ে রাজাকে খবরটা জানাল।

রাজা স্বয়ং নেমে এসে দরজা খুললেন আর তাদের দুজনকে সুস্থ দেখে আনন্দে হয়ে গেলেন আত্মহারা।

সেই তরুণ, সাপের সেই তিনটে পাতা সঙ্গে করে এনেছিল। নিজের ভৃত্যকে সে বলল, "এগুলো সাবধানে রেখে দাও সব সময় যেন তোমার সঙ্গে থাকে। দরকারের সময় এগুলো আমাদের কাজে লাগতে পারে।"

কিন্তু বেঁচে ওঠার পর রাজকন্যের মধ্যে একটা বিরাট পরিবর্তন দেখা দিল। মনে হল স্বামীর প্রতি সব ভালোবাসা তার হৃদয় থেকে যেন মুছে গেছে! কিছুকাল পরে সেই তরুণ জাহাজে করে বেরুল তার বুড়ো বাপকে দেখতে। রাজকন্যেও ছিল সেই জাহাজে। যেতে যেতে সেই জাহাজের এক নাবিককে রাজকন্যে খুব ভালোবেসে ফেলল। এক রাতে সেই তরুণ রাজা যখন ঘুমুচ্ছে—রাজকন্যে ধরল তার মাথা আর সেই নাবিক ধরল তার দুটো পা। আর তার পর দুজনে মিলে তাকে তারা ফেলে দিল সমুদ্রে।

এই দুষ্কর্ম করার পর সেই নাবিককে রাজকন্যে বলল, "এবার দেশে ফেরা যাক। ফিরে বলব, আমার স্বামী পথে মারা গেছে। রাজার কাছে তোমার এত প্রশংসা করব যে নিশ্চয়ই তিনি আমার সঙ্গে তোমার বিয়ে দিয়ে তোমাকে তাঁর উত্তরাধিকারী করে যাবেন।"

কিন্তু সেই বিশ্বাসী ভৃত্য লক্ষ্য করেছিল সমস্ত ঘটনাটা। তাই জাহাজ থেকে চুপি চুপি একটা নৌকা নামিয়ে সে গেল যেখানে তার প্রভুকে ফেলে দেওয়া হয়। তার পর জল থেকে তার মৃতদেহ তুলে সেই পাতা তিনটের একটা সে রাখল তার মুখে আর অন্য দুটো তার দু-চোখে। এইভাবে সে বাঁচিয়ে তুলল তার প্রভুকে।

দিনরাত দাঁড় বেয়ে তারা চলল। ফলে তাদের ছোট্টো নৌকাটা অন্যদের আগেই পৌঁছল সেই বুড়ো রাজার রাজত্বে। তাদের একলা ফিরতে দেখে অবাক হয়ে রাজা কারণটা জানতে চাইলেন। তাঁর মেয়ের শয়তানীর কথা প্রথমটায় তাঁর বিশ্বাসই হল না। সত্য ঘটনা প্রকাশ করার জন্য জামাই আর ভৃত্যকে তিনি বললেন একটা গুপ্ত ঘরে লুকিয়ে থাকতে।

কিছুদিন পরেই জাহাজটা ফিরে এল। সেই শয়তান বউ শোকার্ত বিষণ্ণ মুখে হাজির হল তার বাবার সামনে।

রাজা তাকে প্রশ্ন করলেন স্বামীকে ফেলে একলা সে ফিরেছে কেন? উত্তরে রাজকন্যে বলল, "বাবা! আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে। সমুদ্রে যেতে-যেতে হঠাৎ আমার স্বামী অসুস্থ হয়ে মারা যায়। এই দয়ালু নাবিক

সাহায্য না করলে আমার কী যে হত জানি না। আমার স্বামীর মৃত্যুর সময় এই নাবিক সেখানে উপস্থিত ছিল। সব কথা এ তোমাকে বলতে পারবে।"

শুনে রাজা বললেন, "তোমার মৃত স্বামীকে প্রাণ দিয়ে আমি ফিরিয়ে আনছি।" সেই গুপ্ত ঘরের দরজা খুলে যে দুজন সেখানে লুকিয়ে ছিল রাজা তাদের বললেন বেরিয়ে আসতে।

স্বামীকে জীবন্ত দেখে রাজকন্যে বিস্ময়ে বোবা হয়ে গেল আর তার পর নতজানু হয়ে বসে ক্ষমা প্রার্থনা করতে লাগল।

কিন্তু রাজা তাকে ক্ষমা করলেন না। বললেন, "তোমার জন্যে এ মরতে প্রস্তুত ছিল, তোমাকে এ মৃত্যুর কাছ থেকে ফিরিয়ে এনেছিল। প্রতিদানে ঘুমন্ত অবস্থায় একে তুমি ডুবিয়ে দিয়েছিলে। সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত এবার কর।"

রাজকন্যে আর সেই নাবিককে তলায় ফুটোওয়ালা একটা জাহাজে তুলে সমুদ্রে ছেড়ে দেওয়া হল। দেখতে দেখতে সমুদ্রের ঢেউয়ের তলায় তারা গেল মিলিয়ে।

কুকুর আর চড়ুই

যে-কুকুরটি ভেড়ার পাল পাহারা দিত তার প্রভু ছিল নিষ্ঠুর। তাকে সে পেট ভরে খেতে দিত না। প্রভুর ব্যবহার অসহ্য হয়ে উঠলে বিষণ্ণ মনে তার বাড়ি ছেড়ে সে চলে গেল। পথে তার সঙ্গে এক চড়ুইয়ের দেখা। চড়ুই তাকে বলল, "কুকুর ভায়া, তোমাকে অমন মনমরা দেখাচ্ছে কেন?"

কুকুর বলল, "আমার খিদে পেয়েছে। কিছুই খেতে পাই নি।"

তার কথা শুনে চড়ুই বলল, "আমার সঙ্গে শহরে এসো। পেট ভরে খেতে দেব।"

একসঙ্গে শহরে আসার পর তারা পৌঁছল এক কসাইয়ের দোকানে। চড়ুই তখন কুকুরকে বলল, "ঐখানটায় দাঁড়াও। তোমার জন্যে এক টুকরো মাংস ঠোঁটে করে নিয়ে আসছি।"

দোকানের সামনে বসে ঘাড় ফিরিয়ে চড়ুই দেখে নিল কেউ তাকে লক্ষ্য করছে কি না। তার পর এক টুকরো মাংস অনেকক্ষণ ধরে ঠুকরে ঠুকরে টেবিলের কিনারে এনে ফেলে দিল ফুটপাথের উপর। সেটা এক কোণে নিয়ে গিয়ে কুকুর খেয়ে ফেলল।

চড়ুই তখন বলল, "এবার আরেকটা দোকানে যাওয়া যাক। সেখান থেকে তোমাকে আরেক টুকরো মাংস দেব। তা হলেই তোমার পেট একেবারে ভরে যাবে।"

উত্তরে মাংসের দ্বিতীয় টুকরোটা কুকুর খাবার পর চড়ুই প্রশ্ন করল, "পেট ভরেছে তো, ভায়া?"

কুকুর বলল, "মাংস খেয়ে তৃপ্তি হয়েছে। কিন্তু এখনো রুটি খেতে পাই নি।"

চড়ুই বলল, "রুটিও পাবে। আমার সঙ্গে এসো।"

চড়ুই তাকে নিয়ে গেল এক রুটিওয়ালার দোকানে।

সেখানে গোটা দুই রুটি ঠুকরে-ঠুকরে সে পথে ফেলল। সেগুলো খাবার পর কুকুর চাইল আরো রুটি খেতে। তাই তারা গেল আর-এক রুটিওয়ালার দোকানে আর সেখানেও ঘটল একই ঘটনা।

চড়ুই তখন জিগগেস করল, "এবার পেট ভরেছে তো, ভায়া ?"

কুকুর বলল, "হ্যাঁ, এবার শহরের বাইরে খানিক বেড়ানো যাক।"

তাই তারা গেল বড়ো রাস্তায়। দিনটা ছিল গরম। খানিক যাবার পর কুকুর বলল, সে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, খানিক ঘুমতে চায়।

চড়ুই বলল, "বেশ কথা, ঘুমোও। আমি একটা গাছের ডালে বসে থাকব।"

কুকুর শুয়ে পড়ল আর অল্পক্ষণের মধ্যেই পড়ল গভীর ঘুমে ঘুমিয়ে। সে যখন ঘুমচ্ছে তিন-ঘোড়ায়-টানা এক মালগাড়ি চালিয়ে পথে দেখা গেল এক গাড়োয়ানকে আসতে। মালগাড়িতে ছিল দু পিপে মদ। চড়ুই দেখল পথের চাকার দাগের মধ্যে কুকুর যেখানে ঘুমচ্ছে সেখান দিয়ে গাড়োয়ান গাড়িটা চালিয়ে নিয়ে যাবে। তাই সে চেঁচিয়ে উঠল :

"গাড়োয়ান, কুকুরের ওপর দিয়ে গাড়ি চালিয়ো না। চালালে তোমাকে গরিব করে দেব।"

গাড়োয়ান খিঁচিয়ে উঠে বলল, "হ্যাঃ, চড়ুই আমাকে গরিব করে দেবে !" এই-না বলে ছপ্‌টি হাঁকিয়ে ঘুমন্ত কুকুরের গায়ের উপর দিয়ে গাড়ি চালিয়ে নিয়ে গেল। ফলে কুকুর গেল মরে।

তাই-না দেখে চড়ুই বলল, "আমার কুকুর-ভায়াকে তুমি মেরে ফেললে। তার জন্যে তোমায় দুটো ঘোড়া খেসারত দিতে হবে।"

গাড়োয়ান আবার খিঁচিয়ে উঠে বলল, "হ্যাঃ, আমাকে নাকি দুটো ঘোড়া খেসারত দিতে হবে। তুই আমার কী করতে পারিস, শুনি ?" এই-না বলে সে গাড়ি হাঁকিয়ে চলতে লাগল।

চড়ুই তখন মাল-ঢাকা কাপড়ের নীচে চুপি চুপি সেঁধিয়ে ঠোট দিয়ে ঠুকরে একটা পিপে ফুটো করে দিল। ফলে সব মদ গেল পড়ে। গাড়োয়ান টের পেল না। খানিক পরে পিছনে তাকিয়ে সে দেখে মদ

ঝরে যাচ্ছে। পিপে দুটো পরীক্ষা করে দেখে, একটা খালি। তাই-না দেখে সে চেঁচিয়ে উঠল, "হায় হায়! ভারি লোকসান হয়ে গেল।"

চড়ুই বলল, "পুরোপুরি গরিব হতে এখনো তোমার বাকি আছে।" এই-না বলে একটা ঘোড়ার মাথায় উড়ে গিয়ে বসে ঠুকরে তার চোখ-দুটো চড়ুই উপড়ে ফেলল।

তাই দেখে গাড়োয়ান একটা ইঁট তুলে ছুঁড়ল চড়ুইয়ের দিকে। চড়ুই উড়ে গিয়ে বসল একটা গাছে আর ইঁটটা লাগল আর-একটা ঘোড়ার মাথায়, আর সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়াটা মরে পড়ে গেল।

"হায় হায়, আমি গরিব হয়ে পড়লাম" বলে চেঁচিয়ে উঠল গাড়োয়ান।

দুটো ঘোড়া নিয়ে গাড়োয়ান যখন চলে যাচ্ছে চড়ুই তখন চেঁচিয়ে উঠল, পুরোপুরি গরিব হতে এখনো তোমার বাকি আছে।" এই-না বলে দ্বিতীয় ঘোড়াটার মাথায় বসে চড়ুই তার চোখদুটো উপড়ে দিল।

দারুণ রেগে চড়ুইয়ের দিকে অন্ধের মতো আবার সে ইঁট ছুঁড়ল। কিন্তু চড়ুইয়ের বদলে সেটা লাগল তার তৃতীয় ঘোড়ার মাথায় আর সেটাও মরে পড়ে গেল।

"হায় হায়, আমি গরিব হয়ে পড়লাম," বলে চেঁচিয়ে উঠল গাড়োয়ান।

চড়ুই বলল, "পুরোপুরি গরিব হতে এখনো তোমার বাকি আছে। এবার তোমায় বাড়িতে গরিব করব।" এই-না বলে চড়ুই উড়ে গেল।

ভীষণ চটে আর বিরক্ত হয়ে মালগাড়িটা ফেলে বাড়ি ফিরতে বাধ্য হল গাড়োয়ান। বউকে সে বলল, "হায় হায় বউ, আমার কপাল খুব খারাপ। পিপে থেকে সব মদ পড়ে গেছে আর ঘোড়া তিনটে মরেছে।"

তার বউ বলল, "এখানে এমন একটা পাজি পাখি এসেছে যে তুমি ধারণাই করতে পারবে না। সেটা সঙ্গে করে এনেছে আরো অনেক পাখি। আমাদের সব জই পাখিগুলো খেয়ে শেষ করল।

গাড়োয়ান গিয়ে দেখে হাজার-হাজার পাখি তাদের জই খাচ্ছে আর সেই চড়ুই বসে আছে তাদের মাঝখানে। "হায় হায়, আমি গরিব হয়ে পড়লাম," বলে চেঁচিয়ে উঠল গাড়োয়ান।

চড়ুই বলল, "পুরোপুরি গরিব হতে এখনো তোমার বাকি আছে। যা করেছ তার জন্যে এবার তোমার প্রাণ যাবে, গাড়োয়ান।"

গাড়োয়ানের তখন আর কিছুই নেই। তিতিবিরক্ত আর ভারি মনমরা হয়ে সে গিয়ে বসল উনুনের পাশে।

বাইরে জানালার কিনারে বসে চড়ুই বলল, "যা করেছ তার জন্যে এবার তোমার প্রাণ যাবে, গাড়োয়ান।"

রাগে পাগল হয়ে গাড়োয়ান তার ছোটো কুড়ুলটা ছুঁড়ল। কুড়ুলটা গিয়ে উনুন ভেঙে দু টুকরো করল। চড়ুই তখন লাফিয়ে-লাফিয়ে যেতে লাগল এক জায়গা থেকে আর-এক জায়গায়। আর কুড়ুলটা তার পিছু নিয়ে ভেঙে চলল আসবাব-পত্র, আয়না, ছবি, চেয়ার, টেবিল—সব-কিছু। শেষটায় সেটা গিয়ে ভাঙল বাড়ির দেওয়ালগুলো কিন্তু চড়ুইকে স্পর্শ করল না। শেষটায় গাড়োয়ান কিন্তু চড়ুইকে মুঠো করে ধরে ফেলল।

তার বউ বলল, "দাও, ওটাকে আছড়ে মারি।"

গাড়োয়ান বলল, "না-না, আছড়ে মারলে ওটার উচিত সাজা হবে না। আমি ওটাকে গিলে খাব।" এই-না বলে গাড়োয়ান গিলে ফেলল চড়ুইকে। চড়ুই কিন্তু তার পেটের মধ্যে গিয়ে ডানা ঝাপটাতে শুরু করে দিল। আর ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে লোকটার মুখের মধ্যে উঠে এসে নিজের ছোট্টো মাথাটা বার করে চড়ুই চেঁচিয়ে উঠল, "যা করেছ তার জন্যে এবার তোমার প্রাণ যাবে, গাড়োয়ান।"

গাড়োয়ান তখন বউয়ের হাতে কাটারিটা তুলে দিয়ে বলল, "বউ আমার মুখের মধ্যে ওটার ওপর একটা বাড়ি মার।"

তার বউ কাটারি তুলে বাড়ি বসাল। কিন্তু তার হাত ফসকে বাড়ি গিয়ে পড়ল গাড়োয়ানের মাথায়। সঙ্গে সঙ্গে মরে সে মেঝেয় পড়ল। আর ফুড়ৎ করে উড়ে পালাল চড়ুই।

সাহসী ক্ষুদে দর্জি

গ্রীষ্মকালের সুন্দর এক সকালে ক্ষুদে এক দর্জি জানলার পাশে তার টেবিলের সামনে বসে হাত চালিয়ে ছুঁচ দিয়ে সেলাই করছিল। এমন সময় পথ দিয়ে যেতে-যেতে এক চাষী-মেয়ে হেঁকে চলল, "চাই ভালো সস্তা মার্‌মালেড! ভালো সস্তা মার্‌মালেড!" (কমলালেবুর মোরব্বা)। সেই হাঁক শুনে দর্জির লোভ হল। জানলা দিয়ে কোঁকড়া-চুল-ভরা মাথা বার করে সে বলল, "এসো গো ভালোমানুষের বউ! তোমার সওদার খদ্দের এখানে রয়েছে।"

ভারী চুবড়িটা নিয়ে সিঁড়ি ভেঙে সেই চাষী-মেয়ে দর্জির কাছে এসে তার কথামতো সব পাত্রগুলো সে বার করল। দর্জি একটা-একটা করে পাত্রগুলো নাকের সামনে ধরে শেষটায় বলল, "ভালো-মানুষের বউ, চার আউন্স আমাকে ওজন করে দাও। পৌনে এক পাউণ্ড হলেও আপত্তি নেই।"

চাষী-বউ ভেবেছিল ভালো খদ্দের পাবে। তাই এই সামান্য মার্‌মালেড দর্জিকে দিয়ে বিরক্ত হয়ে গজ্‌গজ্‌ করতে-করতে চলে গেল।

দর্জি বলল, "এই মার্‌মালেড নিয়ে আমি ভগবানের স্তব বলব। তা হলে নিশ্চয়ই চনচনে ক্ষিদে হবে।"

খাবারের আলমারি থেকে পাউরুটি বার করে, এক টুকরো কেটে সেটায় মার্‌মালেড সে মাখাল তার পর বলল, "জানি খেতে ভালোই লাগবে। কিন্তু খাবার আগে এই ওয়েস্টকোটটা শেষ করে ফেলি।"

এই-না বলে মার্‌মালেড-মাখানো রুটির টুকরোটা পাশে রেখে

মনের আনন্দে দিয়ে চলল ছুঁচে বড়ো-বড়ো ফোঁড়। ইতিমধ্যে মার্মালেডের মিষ্টি গন্ধ পেয়ে ভীড় করে মাছির দল এসে দেয়ালে বসল, তার পর সেটা চাখবার জন্য এল নীচে নেমে।

"কে তোদের নেমন্তন্ন করেছে রে?" বলে সেই ক্ষুদে দর্জি তাড়িয়ে দিল সেই-সব অনাহূত অতিথিদের। কিন্তু মাছিগুলো তার ভাষা বুঝল না। তাই না পালিয়ে ঝাঁকে-ঝাঁকে তারা আবার এল ফিরে। তখন সেই ক্ষুদে দর্জি দারুণ চটে একটা তোয়ালে নিয়ে আছড়াতে শুরু করল। ফলে অন্তত গোটা সাতেক মাছি আকাশের দিকে পা তুলে পড়ল মারা। নিজের সাহসের নিজেই তারিফ করে সে বলল, "দারুণ কাণ্ড! শহরময় হৈহৈ পড়ে যাবে।" এই-না বলে সেই ক্ষুদে দর্জি চট্‌পট্‌ একটা বেল্‌ট বানিয়ে তাতে লিখল, "এক ঘায়ে সাতটা কাবু!" তার পর আপন মনে বলে উঠল, 'শুধু শহর নয়, সারা পৃথিবীতে রটে যাবে খবরটা!' উত্তেজনায় ভেড়ার বাচ্ছার লেজের মতো তার বুকটা উঠল ধড়ফড় করে।

সেই বেল্টটা কোমরে জড়িয়ে দর্জি বেরিয়ে পড়ল পৃথিবী ভ্রমণের উদ্দেশ্যে। কারণ তার বিরাট সাহস দেখাবার পক্ষে তার কাজের ঘরটা ছিল নেহাতই ছোটো। আরো কিছু সঙ্গে নিয়ে যাবার মতো আছে কি না দেখার জন্য যাত্রা করার আগে সে তাকাল চার দিকে। দেখল, খানিকটা পুরনো পনীর ছাড়া আর কিছু নেই। সেটাকে সে পকেটে ভরল। দরজার সামনে সে দেখে ঝোপে একটা পাখি আটকা পড়েছে। সেটাকেও সে পকেটে ভরল পনীরটাকে সঙ্গ দেবার জন্য। তার পর হাসিখুশি মুখে পড়ল বেরিয়ে। মানুষটা সে ছিল নেহাত ক্ষুদে। ওজনটাও খুব হালকা। তাই ক্লান্ত হয়ে পড়ল না। যেতে-যেতে সে পৌঁছল একটা পাহাড়ে। সেটার সব চেয়ে উঁচু চুড়োয় পৌঁছে সে দেখে একটা বিশাল চেহারার দৈত্য সেখানে বসে। দৈত্যটা চার দিকে শান্ত চোখে তাকাচ্ছিল। দর্জি তার কাছে গিয়ে বেপারোয়া স্বরে বলল

"শুভদিন, দোস্ত। এখানে বসে-বসে তুমি কি সামনেকার বিরাট পৃথিবীটা দেখছ? আমিও ওখানে চলেছি। আমার সঙ্গে আসার ইচ্ছে আছে?"

নিদারুণ অবজ্ঞার দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে দৈত্য বলল, "দূর ছোঁড়া—পুঁচকে ফাজিল কোথাকার!"

ক্ষুদে দর্জি বলল, "আমাকে তাই ভেবেছ বুঝি। কিন্তু এই দেখো।" কোটের বোতাম খুলে দৈত্যকে সে দেখাল তার বেল্ট। তার পর বলল, "পড়ে দেখো কী ধরনের লোক আমি।"

দৈত্য দেখল লেখা রয়েছে "এক ঘায়ে সাতটা কাবু।" সে ভাবল এক ঘায়ে সাতটা লোককে দর্জি মেরেছে। তখন তার প্রতি দৈত্যর কিছুটা শ্রদ্ধা হল। তবু ভাবল তাকে যাচাই করে দেখা দরকার। তাই একটা পাথর তুলে হাতের মধ্যে গুঁড়িয়ে সে জল বার করে ফেলল।

তার পর বলল, "তোমার যদি সত্যিই শক্তি থাকে তা হলে আমার মতো পাথর গুঁড়িয়ে জল বার করো।"

দর্জি বলল, "এই কথা? এটা তো নেহাত ছেলেখেলা!" এই-না বলে পকেট থেকে নরম পনীর বার করে চটকে জল বার করে ফেলল সে।

দৈত্য অবাক হল। কিন্তু এই ক্ষুদে মানুষটার শক্তি সম্বন্ধে সন্দেহ তার ঘুচল না। তাই সে একটা পাথর তুলে এমন উঁচুতে ছুঁড়ল যে প্রায় দেখাই গেল না।

তার পর বলল, "আমার মতো ছোঁড়ো দেখি—বেঁটে-বাঁটকুল কোথাকার।"

দর্জি বলল, "খাসা ছুঁড়েছ। কিন্তু তোমার পাথরটা তো মাটিতে এসে পড়ল। আমি এমন পাথর ছুঁড়ব যেটা মাটিতেই পড়বে না।"

এই-না বলে পকেট থেকে পাখিটাকে বার করে সে দিল শূন্যে ছুঁড়ে। মুক্তি পেয়ে মনের আনন্দে পাখিটা উড়ে গেল, আর ফিরে এল না। "এবার বল দোস্ত, কেমন লাগল?" প্রশ্ন করল দর্জি।

দৈত্য উত্তর দিল, "মানছি তুমি ভালোই ছুঁড়তে পার। কিন্তু এবার দেখা যাক ভারি বোঝা তুমি বইতে পার কি না।"

এই-না বলে ক্ষুদে দর্জিকে সে নিয়ে গেল প্রকাণ্ড একটা ওক্‌গাছের কাছে। কাটা-অবস্থায় সেটা মাটিতে পড়েছিল। দৈত্য বলল, "ক্ষমতা থাকলে এটাকে বনের বাইরে নিয়ে যেতে আমাকে সাহায্য কর।"

ক্ষুদে দর্জি বলল, "এটা আর শক্ত কি? গুঁড়িটা তুমি কাঁধে নাও। ডালপালাগুলো আমি বইছি—সেটাই সব চেয়ে কঠিন।"

দৈত্য গাছের গুঁড়িটা কাঁধে তুলল আর দর্জি গিয়ে বসল একটা

ডালে। ঘাড় ফিরিয়ে দৈত্য দেখতে পারল না। তাই শুধু যে পুরো গাছটা তাকে বইতে হল তাই নয়, সেই সঙ্গে বইতে হল ক্ষুদে দর্জিকেও।

পিছনকার ডালে বসে যেতে-যেতে মনের আনন্দে দর্জি কখনো দেয় শিস্, কখনো গেয়ে ওঠে টুকরো-টুকরো গান! ভাবখানা—ভারি গাছ বয়ে নিয়ে যাওয়া নেহাতই ছেলে খেলা।

ভারি গাছটা খানিক দূর বয়ে নিয়ে যাবার পর হাঁপাতে-হাঁপাতে দৈত্য চেঁচিয়ে বলল—আর সে বইতে পারছে না, কাঁধ থেকে গাছটা ফেলছে।

সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে নেমে পিছনকার ডালপালা দু হাতে দিয়ে দর্জি ধরল। ভাবখানা—এতক্ষণ সে-ও বয়ে আনছিল গাছটা। তার পর টিটকিরি দিয়ে বলল, "কী কাণ্ড! তোমার মতো জোয়ান লোক একটা গাছ বইতে পারে না!"

খানিক যেতে-যেতে তারা পৌছল একটা চেরিগাছের কাছে। সেটার মাথায় ফলেছিল পাকা-পাকা ফল। গাছটার ঝুঁটি ধরে টেনে নামিয়ে ডালটা দর্জির হাতে দিয়ে দৈত্য তাকে বলল যত খুশি ফল খেতে। কিন্তু ডালটা টেনে ধরার শক্তি সেই ক্ষুদে দর্জির ছিল না। দৈত্য ছেড়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে গাছটা আবার খাড়া হয়ে উঠল, দর্জিও সেই সঙ্গে সোঁ করে উঠে গেল উপরে।

অক্ষত শরীরে দর্জি মাটিতে পড়ার পর দৈত্য বলল, "আরে! ঐ কচি ডালটা দাবিয়ে রাখার ক্ষমতাও তোমার নেই?"

দর্জি উত্তর দিল, এর সঙ্গে ক্ষমতার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। একঘায়ে সাতটাকে মারার পর তুমি কি ভাব ডালটা দাবিয়ে রাখতে পারতাম না? গাছটা টপ্‌কে এলাম, কারণ দেখি ঝোপের মধ্যে বসে এক শিকারী আমার দিকে তাক করছে। গাছটা টপ্‌কাতে তুমি পার?"

দৈত্য টপ্‌কাবার চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না। মগডালে গেল আটকে। তাই-না দেখে দর্জি তো হেসেই কুটোপাটি!

দৈত্য বলল, "তুমি ক্ষুদে মানুষ হলেও খুব সাহসী দেখছি। চলো, আমাদের গুহায় রাত কাটাতে।"

সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে ক্ষুদে দর্জি চলল দৈত্যের সঙ্গে। গুহায় পৌঁছে তারা দেখে অন্য দৈত্যেরা আগুনের চার পাশে বসে। প্রত্যেকের হাতে

একটা করে আগুনে ঝলসানো ভেড়া। এমনভাবে কামড় দিয়ে চলেছে যেন সেগুলো রুটির হালকা টুকরো। দৈত্য তাকে একটা বিছানা দেখিয়ে বলল সেখানে শুয়ে বিশ্রাম নিতে। কিন্তু বিছানাটা ছিল দর্জির পক্ষে বেজায় বড়ো। তাই তাতে না শুয়ে গুটিশুটি এক কোণে গিয়ে বসল দর্জি। মাঝরাত হলে দৈত্য ভাবল ক্ষুদে দর্জি নিশ্চয়ই অঘোরে ঘুমচ্ছে। তাই একটা লোহার গজাল এনে এক ঘায়ে বিছানায় সেটা গেঁথে ভাবল ক্ষুদে ফড়িঙের মতো দর্জির দফা সে নিকেশ করে দিয়েছে।

পরদিন ভোরে দর্জির কথা ভুলে দৈত্যরা গেল বনে। এমন সময় সুস্থ শরীরে আগের মতোই বেপরোয়া চালে দর্জি হাজির হল তাদের কাছে। তাকে দেখে দারুণ ঘাবড়ে গেল দৈত্যের দল। ভাবল তাদের সে এবার মেরে ফেলবে। তাই পড়িমরি করে তারা ছুটে পালাল। ক্ষুদে দর্জি নাক-বরাবর সোজা চলল হেঁটে। অনেক দূর যাবার পর সে পৌঁছল এক রাজপ্রাসাদের অঙ্গনে। বেজায় তখন সে ক্লান্ত। তাই সেখানে শুয়ে সে ঘুমিয়ে পড়ল। সে যখন ঘুমচ্ছে, নানা লোক এসে তার বেল্টের উপরকার সেই লেখাটাই পড়ল—"এক ঘায়ে সাতটা।"

লোকেরা ভাবল, 'নিশ্চয়ই এ মস্ত বড়ো বীরপুরুষ। কিন্তু এখন তো যুদ্ধ নেই—এখানে এসেছে কেন?" তারা গিয়ে রাজাকে খবরটা দিয়ে বলল—যুদ্ধ বাধলে লোকটা খুব কাজে লাগবে, তাই কিছুতেই তাকে যেন যেতে দেওয়া না হয়।

রাজি হয়ে দর্জির কাছে রাজা পাঠালেন তাঁর এক অমাত্যকে। বলে দিলেন দর্জির ঘুম ভাঙলে যেন জানানো হয় তাকে সৈন্যদলে ভর্তি করতে রাজা চান। ঘুম ভাঙার পর চোখ মেলে দর্জি যখন আড়মোড়া ভাঙছে, সেই অমাত্য তাকে জানাল রাজার প্রস্তাব।

দর্জি বলল, "সেইজন্যই তো এখানে আসা। রাজার সৈন্যদলে যোগ দিতেই তো চাই।"

তাকে সসম্মানে সৈন্যদলে ভর্তি করে নেওয়া হল। থাকার জন্য দেওয়া হল খুব ভালো একটা বাড়ি। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই সেই দর্জির উপর হিংসেয় অন্যান্য অফিসাররা জ্বলেপুড়ে মরতে লাগল। ফন্দি আঁটতে লাগল সেখান থেকে তাকে তাড়াবার। নিজেদের মধ্যে তারা বলাবলি করল, "ওর সঙ্গে যদি আমাদের ঝগড়া বাধে আর ও যদি এক-এক ঘায়ে আমাদের সাতজনকে খতম করতে থাকে—তা হলে

আমাদের কী দশা হবে ? তাই রাজার কাছে দল বেঁধে গিয়ে চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে তারা বলল, "এক-এক ঘায়ে সাতটা লোককে যে সাবাড় করতে পারে তার সঙ্গে পাল্লা দেবার উপযুক্ত আমরা নই।"

একজন লোকের জন্য নিজের সমস্ত বিশ্বস্ত কর্মচারীদের হারিয়ে রাজা খুব ক্ষুণ্ণ হলেন। তাঁর মনে হল লোকটার দেখা না পেলেই ভালো হত। তাই ভাবতে লাগলেন—কী করে তাকে তাড়ানো যায়। কিন্তু তাকে বরখাস্ত করার সাহস রাজার হল না। ভাবলেন, জবাব দিলে দর্জি হয়তো তাঁকে আর তাঁর প্রজাদের মেরে ফেলে নিজেই সিংহাসন অধিকার করে বসবে। অনেক ভাবনা চিন্তার পর তাঁর মাথায় একটা ফন্দি এল। লোক মারফত ক্ষুদে দর্জিকে তিনি জানালেন--সে দারুণ সাহসী বীরপুরুষ, তাই তার কাছে একটা প্রস্তাব আছে। প্রস্তাবটা এই : তাঁর রাজত্বের মধ্যে এক বনে দুটো দৈত্য থাকে; খুন-খারাপি লুটপাট করে তারা ভয়ংকর ক্ষতি করে চলেছে; তাদের সামনে যাবার সাহস কারুর নেই। এই দুই দৈত্যকে দর্জি মেরে ফেলতে পারলে তার সঙ্গে নিজের একমাত্র মেয়ের বিয়ে তিনি দেবেন আর সেই সঙ্গে দেবেন অর্ধেক রাজত্ব। দৈত্যদের মারার জন্য দর্জিকে তাঁর একশোজন বীর সৈন্য সাহায্য করবে

দর্জি ভাবল, 'সুন্দরী রাজকন্যে আর অর্ধেক রাজত্ব—কী কাণ্ড!' তাই সে উত্তরে জানাল, "নিশ্চয়ই যাব আর গিয়ে দৈত্যদের খতম করে আসব। আপনার একশোজন বীর সৈন্যের দরকার নেই। এক ঘায়ে সাতজনকে যে মারতে পারে, অনায়াসে দুজনকে সে নিকেশ করতে পারবে।"

ক্ষুদে দর্জি যাত্রা করল। তার পিছনে চলল সেই একশোজন বীর সৈন্য। বনের কিনারে পৌঁছে সঙ্গীদের সে বলল, "তোমরা এখানে থাকো। দৈত্যদের আমি খতম করে আসছি।" একাই সে ছুটে গেল বনের মধ্যে। যেতে-যেতে তাকাতে লাগল ডাইনে আর বাঁয়ে। খানিক পরে সেই দুটো দৈত্যের দেখা পেল সে। একটা গাছের তলায় তারা দুজন ঘুমচ্ছিল। তাদের নাকডাকার শব্দে উপরকার ডালপালার উড়ে যাবার অবস্থা। দু পকেট পাথর ভরে দর্জি সেই গাছটায় চড়ল। ঘুমন্ত দৈত্যদের উপরকার একটা ডালে বসে একটা দৈত্যের বুকের উপর ফেলতে লাগল সে পাথরগুলো। অনেকক্ষণ দৈত্যটা নড়ল না। শেষটায়

জেগে উঠে তার সঙ্গীকে ঠেলা দিয়ে সে বলল, "আমাকে মারছিস কেন ?"

অন্যজন উত্তর দিল, "আমি তো মারি নি। নিশ্চয়ই তুই স্বপ্ন দেখছিস।"

আবার শুয়ে তারা ঘুমিয়ে পড়ল। দর্জি তখন আর-একটা পাথর ফেলল দ্বিতীয় দৈত্যের বুকে।

সে চেঁচিয়ে উঠল, "কী ব্যাপার ? আমাকে পাথর ছুঁড়ে মারছিস কেন ?"

প্রথমজন রেগে গর্ গর্ করে উঠল, "মোটেই পাথর ছুঁড়ে তোকে মারি নি।"

নিজেদের মধ্যে খানিক ঝগড়া করার পর আবার ঘুমে তাদের চোখ বুজে এল। কারণ দুজনেই ছিল খুব ক্লান্ত। ক্ষুদে দর্জি তখন তার সব চেয়ে বড়ো পাথরটা নিয়ে সজোরে ছুঁড়ে মারল প্রথম দৈত্যটার বুকে।

"এ তো ভয়ানক জ্বালা হল দেখছি" বলে চেঁচিয়ে উঠে পাগলের মতো তার সঙ্গীকে এমন জোরে গাছের গুঁড়ির সঙ্গে সে চেপে ধরল যে, থর্থর্ করে কাঁপতে লাগল গোটা গাছটা। অন্যজনও সমান ক্ষেপে উঠে শুরু করে দিল এলোপাথাড়ি কিল-চড়-লাথি মারতে। তার পর দারুণ রেগে শেকড়সুদ্ধ গাছ উপড়ে মারামারি করতে করতে দুজনেই তারা মরে মাটিতে পড়ল।

সঙ্গে সঙ্গে তড়াক করে লাফিয়ে গাছ থেকে নেমে দর্জি বলল, "কী ভাগ্যি—যে-গাছটায় বসেছিলাম সেটা ওরা ওপড়ায় নি। ওপড়ালে কাঠ-বিল্লীর মতো অন্য গাছে লাফিয়ে আমায় যেতে হত।" তার পর নিজের খাপ থেকে তরোয়াল বার করে তাদের বুকে কোপ বসিয়ে সেই বীর সৈন্যদের কাছে গিয়ে সে বলল, "কাজটা হাসিল হয়েছে। দৈত্য দুটোকে খতম করেছি। সাংঘাতিক লড়তে হয়েছে। নিজেদের বাঁচাবার জন্যে গোড়াসুদ্ধ গাছ ওরা উপড়েছিল। কিন্তু এক ঘায়ে যে সাতজনকে কাবু করতে পারে তার সঙ্গে এঁটে উঠবে কী করে ?"

তারা প্রশ্ন করল, "তুমি আহত হও নি ?"

দর্জি বলল, "না। আমাকে মারবার ওরা খুব চেষ্টা করেছিল। কিন্তু আমার মাথার একগাছা চুলও ছুঁতে পারে নি।"

তার কথা সেই সৈন্যদের বিশ্বাস হল না। তাই তারা ঘোড়ায়

চড়ে বনের মধ্যে গেল। আর গিয়ে দেখে নিজেদের রক্তেই দৈত্য দুটো ভাসছে আর চারি দিকে ছড়িয়ে রয়েছে ওপড়ানো অনেক গাছ।

ক্ষুদে দর্জি তার পর রাজার কাছে গিয়ে তার দাবি জানাল। নিজের অঙ্গীকারের কথা স্মরণ করে রাজা মনে-মনে হায় হায় করতে লাগলেন আর মতলব ভাঁজতে লাগলেন—কী করে এই ক্ষুদে মানুষটাকে দূর করা যায়।

শেষটায় তিনি বললেন, "আমার মেয়েকে বিয়ে করা আর আমার অর্ধেক রাজত্ব পাবার আগে তোমাকে আর-একটা দুঃসাহসী কাজ করতে হবে। বনের মধ্যে একটা ইউনিকর্ন ভারি ক্ষতি করে চলেছে। সেটাকে তোমায় ধরতে হবে।"

দর্জি বুক ফুলিয়ে বলল, "দুটো দৈত্যের চেয়েও একটা ইউনিকর্নকে আমি কম ভয় করি। আমার লড়াই করার কায়দা—এক ঘায়ে সাতটা সাবাড় করা।"

প্রাচীন গ্রীক ও রোমান লেখকদের রচনায় এই জন্তুর বর্ণনা আছে। ঘোড়ার মতো তার দেহ আর মাথায় একটা শিঙ।

একগাছা দড়ি আর একটা কুড়ুল নিয়ে বনে পেঁাছে দলের লোক-জনদের সে বলল বাইরে অপেক্ষা করতে। বেশিক্ষণ তাকে খোঁজাখুঁজি করতে হল না। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল সেই ইউনিকনকে। দর্জির দিকে এমনভাবে সেটা তেড়ে এল যেন চক্ষের নিমেষে শিঙ দিয়ে গুঁতিয়ে তাকে শেষ করে ফেলবে।

দর্জি চেঁচিয়ে উঠল, "ধীরে—ধীরে—অত তাড়াহুড়োর দরকার নেই!"

স্থির হয়ে সে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। জন্তুটা একেবারে গায়ের ওপর এসে পড়তে তড়াক করে এক লাফে সে সরে গেল একটা গাছের পিছনে। পাগলের মতো সেই গাছটার দিকে ছুটে গিয়ে শিঙ দিয়ে জন্তুটা এমন জোরে গাছটার গুঁড়ি গুঁতলো যে, সেখানে শক্ত হয়ে গেঁথে গেল তার শিঙ। কিছুতেই টেনে সেটা সে ছাড়াতে পারল না।

গাছের পিছনে থেকে বেরিয়ে এসে দর্জি বলল, "এবার তোমায় কায়দায় পেয়েছি, জাদু!" তার পর দড়িটা তার গলায় বেঁধে, গাছের গুঁড়িতে গাঁথা শিঙটা কুড়ল দিয়ে কেটে সেটাকে সে নিয়ে গেল রাজার কাছে।

রাজা কিন্তু সেই প্রতিশ্রুত পুরস্কার তাকে দিলেন না। তিনি জানালেন তৃতীয় কড়ারের কথা। বললেন—বিয়ের দিনক্ষণ স্থির হবার আগে দর্জিকে ধরতে হবে একটা বুনো শুয়োর। সেখানে সেটা দারুণ উৎপাত করে চলেছে। সেটাকে ধরতে নানা শিকারী সাহায্য করবে।

দর্জি বলল, "সানন্দেই যাচ্ছি। একটা বুনো শুয়োর ধরা তো নেহাতই ছেলেখেলা!" শিকারীদের সঙ্গে সে নিল না। তাতে শিকারীর দল হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। কারণ আগে বুনো শুয়োরটাকে ধরতে গিয়ে তারা দারুণ নাজেহাল হয়েছিল।

দর্জিকে দেখামাত্র দাঁত কিস্‌কিস্‌ করতে-করতে শুয়োরটা তেড়ে এল। মুখ দিয়ে তখন তার গাঁজলা বেরুচ্ছে। কিন্তু সেই চটপটে দর্জি সঙ্গে সঙ্গে সেঁধিয়ে পড়ল কাছের একটা কুঁড়ে ঘরের মধ্যে আর চক্ষের নিমেষে বেরিয়ে গেল জানলা দিয়ে। শুয়োরটা তার পিছন পিছন কুঁড়ে ঘরে ঢুকতে পিছন থেকে ছুটে এসে দর্জি দিল দরজাটা বন্ধ করে। কুঁড়েঘরের মধ্যে বন্ধ হওয়ার দরুন গজরাতে লাগল জন্তুটা। বেজায় সেটা মোটাসোটা। তাই জানলা গলে বেরুতে পারল না।

দর্জি তখন শিকারীদের ডেকে বলল কী ঘটেছে নিজের চোখে দেখে আসতে। তার পর দর্জি গেল রাজার কাছে আর তাকে বলল—এবার

তিনি তাঁর অঙ্গীকার পালন করতে বাধ্য; অর্ধেক রাজত্ব আর রাজকন্যেকে তাকে দিতে হবে। রাজা যদি জানতেন সে বীর সৈনিক নয়, আসলে ছোট্টো এক দর্জি তা হলে নিশ্চয়ই নিজের কথা রাখতেন না।

যাই হোক—ধুমধাম করে বিয়ে হয়ে গেল। সেই দর্জি হল এক রাজা। একদিন সেই তরুণী রানী শোনে ঘুমের মধ্যে তার স্বামী বিড় বিড় করে বলছে, "এই ছোকরা—এক্ষুনি আমার ওয়েস্টকোট শেষ করে ট্রাউজারটা টেঁকে দে, নইলে তোর গজকাঠি দিয়ে তোর মাথায় বাড়ি দেবো।" তখন সে বুঝতে পারল তার স্বামীর জন্ম কোন পরিবারে। পরদিন সকালে তার বাবার কাছে গিয়ে সে অভিযোগ করল—যার সঙ্গে রাজা তার বিয়ে দিয়েছেন, আসলে সে নগণ্য একটা দর্জি।

রাজা মেয়েকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, "কাল রাতে ঘরের দরজাটা খুলে রাখিস। আমার চাকর বাইরে অপেক্ষা করবে। ও ঘুমিয়ে পড়লে চুপি চুপি ভেতরে গিয়ে দড়ি দিয়ে বেঁধে তাকে তুলে দেবে একটা জাহাজে। জাহাজটা তাকে নিয়ে চলে যাবে পৃথিবীর অন্য প্রান্তে।"

কথাটা শুনে রাজকন্যে খুশি হল। কিন্তু দর্জি-রাজার ভৃত্য অন্য রাজার কথাগুলো শুনেছিল। তাই প্রভুর কাছে গিয়ে এই ষড়যন্ত্রের কথা ফাঁস করে দিল।

সব শুনে দর্জি-রাজা বলল, "ঠিক আছে। এই সামান্য ব্যাপারটার নিষ্পত্তি আমি করছি।"

রাতে যথাসময়ে সে গিয়ে শুলো তার বউয়ের পাশে। রাজকন্যের যখন মনে হল দর্জি-রাজা ঘুমিয়ে পড়েছে তখন চুপি চুপি উঠে দরজাটা খুলে দিয়ে ফিরে এসে আবার শুয়ে পড়ল। ছোট্টো দর্জি ঘুমের শুধুই ভান করছিল। হঠাৎ সে তীব্র গলায় চেঁচিয়ে উঠল, "এই ছোকরা—এক্ষুনি আমার ওয়েস্টকোট শেষ করে ট্রাউজারটা টেঁকে দে, নইলে তোর গজকাঠি দিয়ে তোর মাথায় বাড়ি দেব। এক ঘায়ে সাতজনকে আমি খতম করেছি, মেরেছি দুটো দৈত্য, ধরেছি একটা ইউনিকর্ন আর বুনো শুয়োর। দরজার বাইরে যে দাঁড়িয়ে তাকে আমি পরোয়া করি নাকি?

ছোট্টো দর্জির চীৎকার শুনে সবাই ভীষণ ভয় পেয়ে গেল। যারা তাকে বাঁধতে এসেছিল তারা পড়িমড়ি করে ছুটে পালাল। আর তার পর কেউই তাকে কোনোদিন স্পর্শ করতে সাহস করে নি। এইভাবে সেই ছোট্টো দর্জি সারা জীবন কাটালো রাজা হয়ে।

সিন্ডারেলা

এক বড়োলোকের বউ একদিন হঠাৎ অসুখে পড়ল। সে বুঝল তার দিন ঘনিয়ে এসেছে। তাই তার একমাত্র ছোট্টো মেয়েটিকে নিজের বিছানার পাশে ডেকে বলল, "বাছা! সর্বদা ভালো হয়ে থাকিস, ধর্মে মতি রাখিস। তা হলে ভগবান তোর মঙ্গল করবেন। স্বর্গ থেকে তোর ওপর নজর রাখব।" এই বলে চিরকালের মতো সে চোখ বুজল।

মেয়েটি তার মায়ের কবরের কাছে প্রতিদিন যায় আর কাঁদে আর ধর্মে মতি রেখে ভালো হয়ে থাকে। শীত এল। তুষারে ঢেকে গেল তার মায়ের কবর। কিন্তু বসন্তের রোদে তুষার গলবার আগেই সেই বড়োলোক আবার বিয়ে করল।

এই নতুন বউয়ের ছিল দুই মেয়ে। তারাও এল তাদের মায়ের সঙ্গে থাকতে। চেহারা তাদের সুন্দর কিন্তু হৃদয় জঘন্য শয়তানীতে ভরা। বেচারা সৎমেয়েটির সময় খুব খারাপ কাটতে লাগল। তারা বলল, "এই বোকাটা আমাদের সঙ্গে বৈঠকখানায় বসতে পাবে না। রুটি যে খাবে তাকে সেটা রোজগার করতে হবে। মেয়েটা রান্নাঘরের দাসীর কাজ করুক। তার ভালো-ভালো পোশাক কেড়ে নিয়ে তাকে দিল একটা

পুরনো ছাই-রঙা সায়া আর কাঠের জুতো। তারা বলল, "দেমাকী রাজকন্যেকে একবার দেখো—কী সুন্দর তাকে দেখাচ্ছে!" মুখ ভেংচে নানারকম ঠাট্টা-তামাশা করে তারা তাকে পাঠিয়ে দিল রান্নাঘরের কাজে। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত সেখানে তাকে খাটতে হয় হাড়ভাঙা খাটুনি। কুয়ো থেকে জল সে তোলে, উনুন ধরায়, রাঁধে আর বাসন মাজে। তা ছাড়া সেই দুই বোনের অকথ্য আরো নানা অপমান তো আছেই। মটর-মসুরদানা ছাইগাদায় তারা ছড়ায় যাতে সেগুলো বেছে-বেছে তাকে তুলতে হয় আর রাতে যখন সে বেজায় ক্লান্ত হয়ে পড়ে, তাকে তারা শোবার কোনো বিছানা দেয় না। তাকে শুতে হয় উনুনের পাশের ছাইগাদায়। সব সময় তার গায়ে ছাই লেগে থাকে। সব সময় তাকে দেখায় খুব নোংরা। তাই তাকে তারা ডাকে সিন্‌ডারেলা[১] বলে।

একদিন ঘোড়ায় চেপে তাদের বাবা শহরে গেল গির্জায় উপাসনা করতে। যাবার আগে তার দুই সৎমেয়েকে জিগ্‌গেস করল কী তাদের জন্য সে নিয়ে আসবে।

একজন বলল, "খুব সুন্দর একটা পোশাক।" অন্যজন বলল, "মুক্তো আর চুনি।"

তার বাবা প্রশ্ন করল, "সিন্‌ডারেলা, তোর কী চাই?"

"বাড়ি ফেরার সময় প্রথম যে হেজেলগাছের ডালে ফুল ফুটেছে দেখবে সেই ডালটা আমার জন্যে এনো।

সেই বড়োলোক বাবা তার সৎমেয়েদের জন্যে কিনল ভালো-ভালো পোশাক আর মুক্তো-চুনি-পান্না। আর ফেরার সময় একটা ফুলে ভরা হেজেল-ডাল তার টুপিতে লাগতে সেটা ভেঙে সে নিয়ে এল। বাড়িতে সৎমেয়েদের উপহারগুলো দিয়ে সিন্‌ডারেলাকে সে দিল হেজেলগাছের সেই ডালটা।

বাবাকে ধন্যবাদ জানিয়ে সেই ডালটা নিয়ে সিন্‌ডারেলা গেল তার মার কবরের কাছে। ডালটা সেখানে পুঁতে অঝোরে সে কাঁদতে লাগল। টপ্ টপ্ করে তার চোখের জল পড়ল সেই ডালে। কিছুদিনের মধ্যেই সেই ডালটা হয়ে উঠল চমৎকার একটা গাছ। প্রতিদিন তিন-বার

[১] ইংরাজিতে cinder মানে আঙার বা পোড়া কাঠ।

করে সিন্‌ডারেলা যায় তার মার কবরের কাছে আর গাছটার তলায় থাকে বসে। সে বসে থাকে আর কাঁদে আর প্রার্থনা করে। সেই গাছের ডালে বসে থাকে সাদা ছোট্টো একটা পাখি আর সিন্‌ডারেলা কোনো জিনিসের জন্য প্রার্থনা করলে সেটা সে মনে করে রাখে।

সেবার হল কি—রাজা আয়োজন করলেন, বিরাট এক ভোজ-সভার। দেশের সব চেয়ে সুন্দরী মেয়েদের সেখানে নিমন্ত্রণ করা হল যাতে তাদের মধ্যে থেকে রাজপুত্তুর তার বউ পছন্দ করতে পারে। সেই ভোজসভায় উপস্থিত থাকতে হবে শুনে দুই সৎবোন আবেগ-উত্তেজনায় ফেটে পড়ল। সিন্‌ডারেলাকে তারা আদেশ দিল তাদের চুল বাঁধতে, জুতো পরাতে আর বগলস্‌গুলো চকচকে করে পালিশ করতে। বলল, "এগুলো ভালো করে কর—কারণ আমরা চলেছি রাজপ্রাসাদে বল্‌-নাচের সভায়।"

সিন্‌ডারেলা তাদের হুকুম মতো কাজগুলো করে দিল। তার পর লাগল কাঁদতে। কারণ তারও খুব ইচ্ছে করছিল রাজপ্রাসাদের সেই বল্‌-নাচের সভায় যাবার। শেষটায় সৎমার কাছে গিয়ে সে বলল তাকে নিয়ে যেতে।

সবাই হৈহৈ করে বলে উঠল, "বলছিস কি সিন্‌ডারেলা! তুই যাবি রাজবাড়ির বল্‌-নাচের আসরে—তোর মতো ময়লা নোংরা ছেঁড়া পোশাক পরা মেয়ে? নাচের আসরে, ভাব একবার ওর কথা! তোর না আছে বল্‌-নাচের পোশাক, না আছে নাচবার জুতো।"

কিন্তু তাকে নিয়ে যাবার জন্য সে কাকুতি-মিনতি করতে লাগল। শেষটায় তাদের একজন বলল, "ছাইগাদায় এক বাটি মসুরদানা আমি ফেলেছি। দু ঘণ্টার মধ্যে সেগুলো বেছে তুলতে পারলে তোকে নিয়ে যাওয়া হবে।"

মেয়েটি খিড়কি-দরজা দিয়ে বাগানে বেরিয়ে বলল:

"পোষা পায়রা, ঘুঘু আর ছোট্টো পাখির দল, আমাকে মসুরদানাগুলো বাছতে সাহায্য কর:

ভালোটা যাবে বিস্কুট-টিনে
মন্দগুলো ডাস্টবিনে।"

তার ডাক শুনে রান্নাঘরের জানলায় নামল দুটো সাদা পায়রা, তার পর দুটো ঘুঘু আর তার পর ঝাঁকে ঝাঁকে পাখির দল। ছাইগাদায়

নেমে তারা ডানা ঝাপটাতে লাগল। প্রথমে মাথা নাড়িয়ে কুট্‌-কুট্‌-কুট্‌ করে পায়রাগুলো মসুরদানা বাছতে শুরু করল আর তার পর অন্য সব পাখিগুলোও শুরু করে দিল কুট্‌-কুট্‌-কুট্‌ করে বাছতে। এক ঘণ্টার মধ্যে সব ভালো মসুরদানাগুলো বেছে-বেছে টিনে ফেলে তারা উড়ে গেল।

সিন্‌ডারেলা তখন মসুরদানার বাটিটা মনের আনন্দে নিয়ে গেল তার সৎমার কাছে। কারণ সে ভেবেছিল এবার নিশ্চয়ই নাচের আসরে তাকে তারা নিয়ে যাবে।

কিন্তু তার সৎমা বলল, "না সিন্‌ডারেলা। তোর পোশাক নেই আর তা ছাড়া তুই নাচতেও পারিস না। তোকে দেখে সবাই হাসবে।"

কিন্তু সিন্‌ডারেলা আবার কাঁদতে শুরু করলে তার সৎমা বলল, "ছাইগাদা থেকে দু বাটি মসুরদানা বাছতে পারলে তোকে নিয়ে যাব।" মনে-মনে সৎমা ভাবল, 'এটা করা ওর পক্ষে একেবারে অসম্ভব।'

ছাইগাদায় দু বাটি মসুরদানা ফেলার পর মেয়েটি আবার বাগানে গিয়ে বলল, "পোষা পায়রা, ঘুঘু আর ছোট্টো পাখির দল, আমাকে মসুর-দানাগুলো বাছতে সাহায্য কর :

ভালোটা যাবে বিস্কুট-টিনে
মন্দগুলো ডাস্টবিনে।"

তার ডাক শুনে রান্নাঘরের জানলায় নামল দুটো সাদা পায়রা, তার পর দুটো ঘুঘু আর তার পর ঝাঁকে-ঝাঁকে পাখির দল। ছাইগাদায় নেমে তারা ডানা ঝাপটাতে লাগল। প্রথমে মাথা নাড়িয়ে কুট্‌-কুট্‌-কুট্‌ করে পায়রাগুলো মসুরদানা বাছতে শুরু করল আর তার পর অন্য সব পাখিগুলোও শুরু করে দিল কুট্‌-কুট্‌-কুট্‌ করে বাছতে। আধ ঘণ্টার মধ্যে সেই দুটো বাটি ভরে গেল। এক মুখ হেসে বাটি দুটো সৎমার কাছে নিয়ে গেল সিন্‌ডারেলা। কারণ তার ধারণা এবার নিশ্চয়ই তাকে নিয়ে যাওয়া হবে।

কিন্তু সৎমা বলল, "না না—আমাদের সঙ্গে কী করে যাবি? তোর পোশাক নেই, তা ছাড়া তুই তো নাচতেও পারিস না। তোকে নিয়ে গেলে লজ্জায় আমাদের মাথা হেঁট হবে।" এই-না বলে তার দুই দাম্ভিক মেয়েকে নিয়ে সে চলে গেল।

বাড়ি খালি হয়ে যেতে সিন্‌ডারেলা গেল তার মায়ের কবরের কাছে। তার পর সেই হেজেলগাছের নীচে বসে বলল :
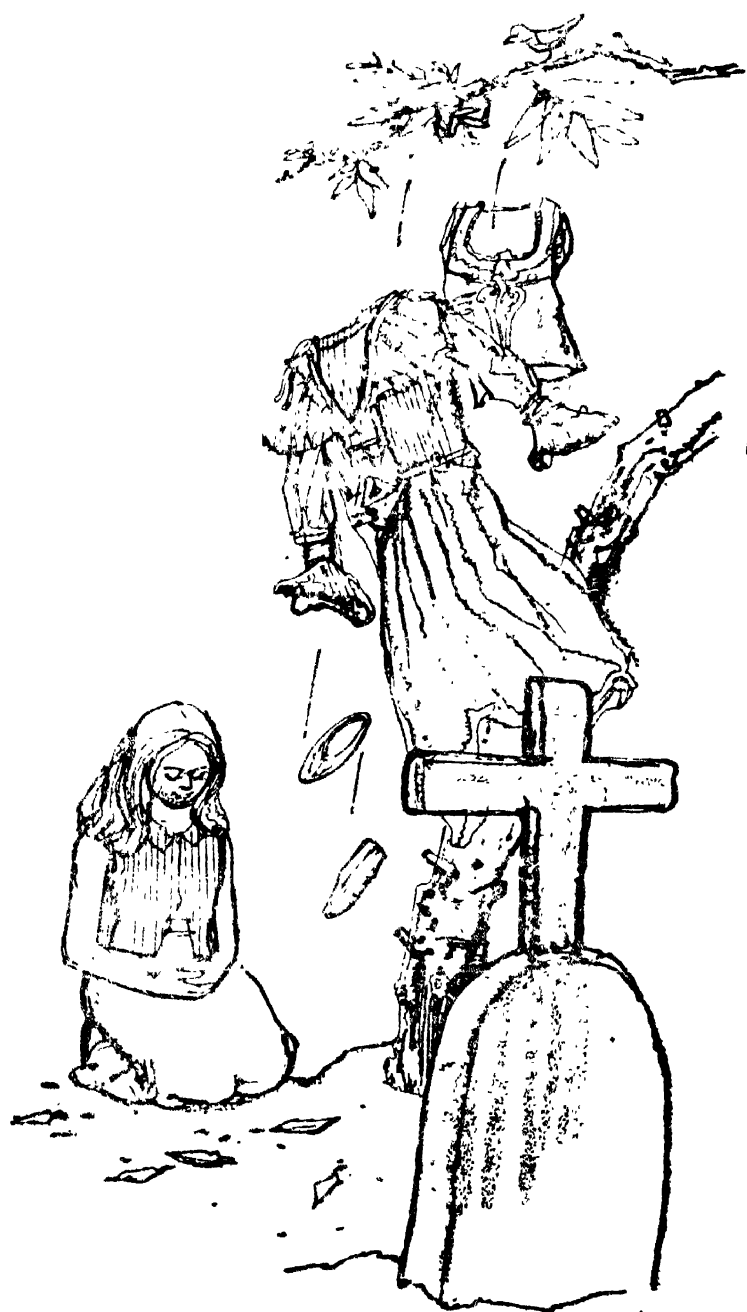
"ছোট্টো গাছ, ঝরাও-ঝরাও,
সোনালী-রুপোলী পোশাক পরাও।"

তাই শুনে সেই সাদা পাখিটা উপর থেকে ফেলে দিল সোনা আর রুপোর কাজ-করা পোশাক আর সিল্কের উপর রুপোলী নক্‌শার এক জোড়া চটি জুতো।

চট্‌পট্‌ সেগুলো পরে নিয়ে সিন্‌ডারেলা হাজির হল রাজপ্রাসাদের নাচের আসরে। তার সৎমা আর বোনেরা তাকে চিনতেই পারল না। ভাবল বিদেশের বুঝি কোনো রাজকন্যে—সোনালী পোশাকে এমনই তাকে চোখ-ধাঁধানো সুন্দর দেখাচ্ছিল। সে যে সিন্‌ডারেলা—সে কথা এরা স্বপ্নেও ভাবতে পারে নি। তাদের ধারণা সিন্‌ডারেলা তখন বাড়িতে কালিঝুলি মেখে মসুরদানা বাছছে।

রাজপুত্তুর তার কাছে গিয়ে তার হাত ধরল। তার পর শুরু করল তার সঙ্গে নাচতে। অন্য কারুর সঙ্গেই সে নাচতে চাইল না। সিন্‌ডারেলার সঙ্গে যে-ই নাচতে আসে তাকেই সে বলে দেয়, "এ আমার নাচের সঙ্গিনী।"

রাজপুত্তুরের সঙ্গে মাঝরাত পর্যন্ত সিন্‌ডারেলা নাচল তার পর বলল বাড়ি ফিরবে।

রাজপুত্তুর বলল, "তোমার সঙ্গে তোমার বাড়ির দোরগোড়া পর্যন্ত যাব।" তার পর জানতে চাইল কোথায় এই সুন্দরী মেয়েটি থাকে। সিন্‌ডারেলা কিন্তু পায়রা-ঘরের মধ্যে লাফিয়ে ঢুকে রাজপুত্তুরকে এড়িয়ে গেল। বাইরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে চলল রাজপুত্তুর। সিন্‌ডারেলার বাবা ফিরতে তাকে সে বলল সেই অচেনা মেয়েটি পায়রা-ঘরের মধ্যে লাফিয়ে ঢুকেছে।

বুড়ো বাপ ভাবল, 'সেই অচেনা সুন্দরী সিন্‌ডারেলা নাকি?' তার পর কুড়ুল এনে পায়রা-ঘরটা টুকরো-টুকরো করে ফেলা হল। কিন্তু দেখা গেল ভিতরে কেউ নেই। বাড়ির ভিতরে গিয়ে তারা দেখে নোংরা পোশাক পরে সিন্‌ডারেলা বসে আছে ছাইগাদার মধ্যে আর চিমনির এক কোণে টিম্‌টিম্‌ করছে মাত্র একটি তেল-বাতি। কারণ পায়রা-ঘরের পিছন দিক দিয়ে বেরিয়ে তার মায়ের কবরের পাশে সেই হেজেলগাছের কাছে সিন্‌ডারেলা ছুটে গিয়ে তার সুন্দর পোষাক বদলে পুরনো ছাই-রঙা সায়াটা আর কাঠের জুতো-জোড়া

পরে রান্নাঘরে ফিরে আসে। পাখিটা নিয়ে যায় তার সেই সুন্দর পোশাকটা।

পরদিন সেই নাচ-গান-ভোজের উৎসবে তার বাবা, সৎমা আর সৎবোনেরা চলে গেলে সিন্‌ডারেলা আবার তার মায়ের কবরের পাশে সেই হেজেলগাছের কাছে গিয়ে বলল :

"ছোট্টো গাছ, ঝরাও-ঝরাও,
সোনালী-রুপোলী পোশাক পরাও।"

এবার পাখিটা ঝুপ্ করে ফেলে দিল আগের চেয়েও জমকালো পোশাক। উৎসব-সভায় সিন্‌ডারেলা পৌঁছলে তার রূপ দেখে সবাই দারুণ অবাক হয়ে ভাবতে লাগল—মেয়েটি কে ?

রাজপুত্তুর তার জন্যেই অপেক্ষা করছিল। সে আসতে সঙ্গে সঙ্গে কাছে গিয়ে রাজপুত্তুর তার হাত ধরল। অন্য কারুর সঙ্গে সে নাচল না। সিন্‌ডারেলার সঙ্গে যে-ই নাচতে আসে তাকেই বলে দেয়, "এ আমার নাচের সঙ্গিনী।"

মাঝরাতে সিন্‌ডারেলা বলল, বাড়ি ফিরবে। রাজপুত্তুর গেল তার পিছন পিছন। কারণ সে দেখতে চেয়েছিল কোন বাড়িতে সিন্‌ডারেলা থাকে। কিন্তু বাড়ির পিছনকার বাগানে সিন্‌ডারেলা দৌড়ে পালিয়ে গেল। সেখানে ছিল ভারি সুন্দর লম্বা একটা গাছ। তাতে ঝুলছিল অনেক রসালো নাশপাতি। কাঠবিল্লির মতো তরতর করে সেটায় উঠে, ডালপালার মধ্যে সিন্‌ডারেলা লুকিয়ে পড়ল। রাজপুত্তুর বুঝতে পারল না কোথায় গেল।

সিন্‌ডারেলার বাবা ফিরতে তাকে সে বলল, "অচেনা মেয়েটি আমার কাছ থেকে দৌড়ে পালিয়েছে। মনে হয় সে লুকিয়ে রয়েছে নাশপাতি গাছটার মধ্যে।"

বুড়ো বাপ ভাবল, 'সেই অচেনা সুন্দরী সিন্‌ডারেলা নাকি ?' তার-পর কুড়ুল এনে গাছটা কাটা হল। কিন্তু দেখা গেল সেখানে কেউ নেই। রান্নাঘরে গিয়ে তারা দেখে নোংরা ছেঁড়া পোশাক পরে সিন্‌ডারেলা বসে আছে ছাইগাদার মধ্যে। কারণ নাশপাতি গাছটার পিছন থেকে লাফিয়ে নেমে তার মায়ের কবরের পাশে ছুটে গিয়ে পাখিটাকে সিন্‌-ডারেলা তার সুন্দর পোশাকটা দিয়ে দেয় তার পর সেই ছাই-রঙা সাজা পরে ফিরে আসে।

তৃতীয় দিন সেই নাচ-গান-ভোজের উৎসবে তার বাবা, সৎমা আর সৎবোনেরা চলে গেলে সিন্‌ডারেলা আবার তার মায়ের কবরের পাশে সেই হেজেলগাছের কাছে গিয়ে বলল :

"ছোট্টো গাছ, ঝরাও-ঝরাও,
সোনালী-রুপোলী পোশাক পরাও ।"

সঙ্গে সঙ্গে পাখিটা ঝুপ্ করে ফেলে দিল এমন সুন্দর জমকালো পোশাক যেটার তুলনা নেই । এবারকার চটি-জোড়াটাও খাঁটি সোনার। বল্-নাচের আসরের অতিথিরা দেখে দেখে একেবারে মুগ্ধ ।

সারা সন্ধে রাজপুত্তুর শুধু তার সঙ্গে নাচল । সিন্‌ডারেলার সঙ্গে যে-ই নাচতে আসে তাকেই সে বলে দেয়, "এ আমার নাচের সঙ্গিনী ।"

রাত বাড়লে সিন্‌ডারেলা বলল সে বাড়ি ফিরবে । রাজপুত্তুর বলল সঙ্গে গিয়ে পৌঁছে দিয়ে আসবে । কিন্তু এমন চট্‌পট্ সে পালাল যে রাজপুত্তুর তার পিছু নিতে পারল না ।

এবার কিন্তু রাজপুত্তুর একটা ফন্দি এঁটেছিল—গোটা সিঁড়িতে মাখিয়ে রেখেছিল আটা । তাই সিন্‌ডারেলা দৌড়ে পালাবার সময় তার একপাটি চটি সেখানে গেল আটকে । রাজপুত্তুর কুড়িয়ে নিয়ে দেখে—সেটা সুন্দর, ছোট্টো, সোনার চটি ।

পরদিন সকালে সিন্‌ডারেলার বাবার কাছে গিয়ে রাজপুত্তুর বলল, "এই চটিটা যার পায়ে হবে তাকেই আমি বিয়ে করব ।"

রাজপুত্তুরের কথা শুনে সৎবোনেদের খুশি আর ধরে না । কারণ তাদের দুজনেরই পা ছোট্টো আর সুন্দর । চটিটা নিয়ে বড়ো বোন গেল তার ঘরে । কিন্তু তার মোটা বুড়ো আঙুল কিছুতেই সেটার মধ্যে ঢুকল না । তার মা পাশে দাঁড়িয়েছিল । মেয়েকে একটা ছুরি দিয়ে বলল, "বুড়ো আঙুলটা কেটে ফেল । রানী হলে তোকে কখনো হাঁটতে হবে না ।" বড়ো বোন বুড়ো আঙুলটা কেটে, চটির মধ্যে জোর করে পা ঢুকিয়ে, কোনোরকমে যন্ত্রণা চেপে হেঁটে গেল রাজপুত্তুরের কাছে । রাজপুত্তুর তাকে নিজের ঘোড়ায় চড়িয়ে যেতে শুরু করল । যেতে-যেতে তারা পৌঁছল সেই কবরের পাশে। সেখানকার হেজেলগাছটায় বসেছিল ছোট্টো দুটো পায়রা । তারা চেঁচিয়ে উঠল :

"অবাক কাণ্ড ! আরে একি !
রক্ত ঝরে জুতোয় দেখি !
ছোট্টো জুতো—দে—খে—ছ ?
ভুল কনেকে—এ—নে—ছ !"

কনের পায়ের দিকে তাকিয়ে রাজপুত্তুর দেখে ঝর্‌ঝর্‌ করে রক্ত পড়ছে। ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে ভুল কনেকে নিয়ে সে ফিরে গেল। তার বাবাকে সে বলল অন্য মেয়েকে চটিটা পরতে। সেই মেয়ে চটি নিয়ে নিজের ঘরে গেল, তার বুড়ো আঙুলটা ঢকল। কিন্তু গোড়ালিটা কিছুতেই ভিতরে সেঁধুল না।

মেয়ের মা পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। মেয়ের হাতে একটা ছুরি দিয়ে সে বলল গোড়ালিটা কেটে ফেলতে। বলল, "রানী হলে তোর কখনো আর হাঁটতে হবে না।" মেয়েটা তার গোড়ালির খানিকটা কেটে চেপেচুপে জুতোটা পরল। তার পর কোনোরকমে যন্ত্রণা চেপে গেল রাজপুত্তুরের কাছে। আর রাজপুত্তুর তাকে নিজের ঘোড়ায় চড়িয়ে যেতে শুরু করল।

যেতে-যেতে তারা পৌঁছল সেই হেজেলগাছটার কাছে। আর সঙ্গে সঙ্গে সেই দুটো ছোট্টো পায়রা উড়ে এসে গাছটায় বসে চেঁচিয়ে উঠল :

"অবাক কাণ্ড ! আরে একি !
রক্ত ঝরে জুতোয় দেখি !
ছোট্টো জুতো- দেখেছ ?
ভুল কনেকে এনেছ !"

কনের পায়ের দিকে তাকিয়ে রাজপুত্তুর দেখে ঝরঝর করে রক্ত পড়ছে। সাদা মোজা-দুটো লাল হয়ে গেছে। তাই ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে ভুল কনেকে নিয়ে আবার সে ফিরে গেল তাদের বাড়িতে।

রাজপুত্তুর বলল, "এ-মেয়েটাও আসল কনে নয়। তোমার আর মেয়ে নেই ?"

সিন্‌ডারেলার বাবা উত্তর দিল, "না—। তবে আর-একজন আছে। সে আমার আগের বউয়ের মেয়ে। কালিঝুলি-মাখা, আধ-পেট-খাওয়া হতকুচ্ছিত একটা। আসল কনে কখনোই সে হতে পারে না।"

রাজপুত্তুর বলল তাকে নিয়ে আসতে। কিন্তু সৎমা বাধা দিয়ে বলল, "না-না—মেয়েটা কালিঝুলি-মাখা বদখদ। তাকে দেখাতে লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাবে।"

রাজপুত্তুর কিন্তু আদেশ দিল সিন্ডারেলাকে নিয়ে আসতে। মেয়েটি প্রথমে ভালো করে ধুলো তার মুখ আর হাত, তার পর এসে নতজানু হয়ে রাজপুত্তুরকে অভিবাদন করল। রাজপুত্তুর তার হাতে দিল সোনার চটিটা। একটা টুলে বসে পা থেকে কাঠের ভারী জুতোটা খুলে সোনার চটির মধ্যে পা সে ঢোকাল। আর খুব সহজেই তার পা গেল সোনার চটির মধ্যে সেঁধিয়ে।

মেয়েটি দাঁড়িয়ে উঠে মুখ ফেরাবার সঙ্গে সঙ্গে রাজপুত্তুর চিনতে পারল—এই সেই মেয়ে, যার সঙ্গে সে নেচেছে। রাজপুত্তুর চেঁচিয়ে উঠল, "এই তো আমার আসল বউ।"

সেই সৎমা আর সৎবোনেরা, রাগে ফুঁস্‌তে-ফুঁস্‌তে সরে গেল। আর রাজপুত্তুর নিজের ঘোড়ায় সিন্ডারেলাকে উঠিয়ে নিয়ে যেতে শুরু করল।

যেতে-যেতে পেঁছিল সেই হেজেলগাছটার কাছে। আর সঙ্গে সঙ্গে সেই দুটো ছোট্টো পায়রা উড়ে এসে গাছটায় বসে চেঁচিয়ে উঠল :

"অবাক কাণ্ড! দ্যাখো, দ্যাখো!
জুতোয় রক্ত ঝরছে নাকো।
জুতো নয় ছোট্টো
দেখেছ ?
আসল কনে এনেছ।"

এই-না বলে পায়রা দুটো উড়ে এসে বসল সিন্ডারেলার কাঁধে—একটা ডান দিকে, অন্যটা বাঁ দিকে।

শয়তান বোনেরা এল রাজপুত্তুরের বিয়েতে আর সিন্ডারেলাকে খোশামোদ করে চেষ্টা করল তার সঙ্গে নিজেদের আত্মীয়তার কথা জাহির করতে।

বর-বউ যখন গির্জের দিকে যেতে শুরু করল সিন্ডারেলার ডান পাশে তখন বড়ো বোন, বাঁ পাশে ছোটো। সেই দুটো পায়রা এসে উপড়ে নিল তাদের একটা করে চোখ। বর-বউ যখন গির্জে থেকে ফিরছে সিন্ডারেলার ডান পাশে তখন ছোটো বোন, বাঁ পাশে বড়ো। সেই দুটো পায়রা আবার উড়ে এসে উপড়ে নিল তাদের আর-একটা করে চোখ। নিজেদের নিষ্ঠুরতার জন্য আজীবন অন্ধ হয়ে থেকে এই ভাবে তারা পেল শাস্তি।
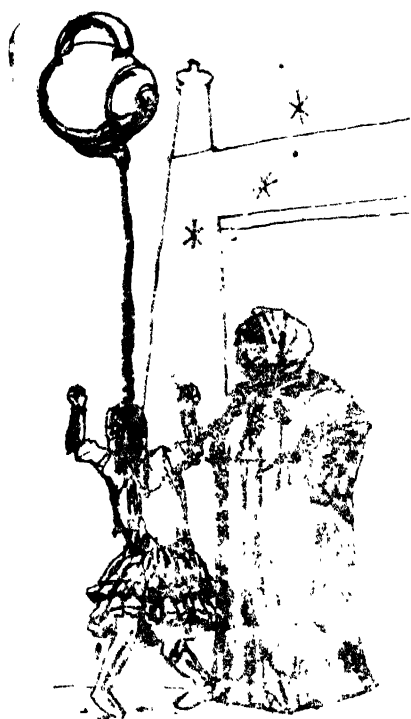
হোল্‌লে ঠাকরুন

এক বিধবার ছিল দুই মেয়ে। একজন সুন্দরী আর পরিশ্রমী। অন্যজন কুচ্ছিত আর কুঁড়ে। বিধবা কিন্তু বেশি ভালোবাসত কুচ্ছিত আর কুঁড়ে মেয়েকে, কারণ সে ছিল তার নিজের মেয়ে। অন্যজনকে করতে হত সব কাজকর্ম— সংসারের সে ছিল সিন্‌ডারেলা[১]। মেয়েটাকে রোজ বেরুতে হত বড়ো রাস্তায় আর তার পর একটা কুয়োপাড়ে বসে তকলি দিয়ে কাটতে হত সুতো। সুতো কাটতে-কাটতে তার আঙুল দিয়ে রক্ত ঝরত। একদিন তার তকলিতে রক্ত মাখামাখি হয়ে গেলে কুয়োয় সেটা ধুতে সে গেল আর সঙ্গে সঙ্গে তার হাত ফস্‌কে সেটা পড়ে গেল কুয়োর মধ্যে। কাঁদতে-কাঁদতে সৎমার কাছে গিয়ে সব কথা সে জানাল। সৎমা তো রেগে আগুন। খুব তাকে সে গালাগালি করল।

[১]যে রূপবতী গুণবতী মেয়ে সংসারে তার রূপগুণের আদর পায় না।

তার পর বলে দিল কুয়ো থেকে তকলিটা তুলে না আনলে কিছুতেই তাকে ক্ষমা করবে না। কুয়োর কাছে ফিরে গেল মেয়েটি। কিন্তু কী করবে ভেবে পেল না। শেষটায় আরো বকুনি খাবার ভয়ে কুয়োর মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে সে অজ্ঞান হয়ে গেল। জ্ঞান হতে দেখে ঝলমলে রোদে সে শুয়ে আছে সবুজ এক মাঠে। চার দিকে হাজার-হাজার সুন্দর ফুল। উঠে পড়ে সেই মাঠ দিয়ে যেতে সে পৌঁছল রুটি সেঁকার এক চুল্লির কাছে। সেটায় ভরা পাউরুটি।

পাউরুটিগুলো বলল, "আমাদের বার করে নাও। নইলে পুড়ে যাব। অনেকক্ষণ ধরে আমরা সেঁকা হচ্ছি।"

মেয়েটি এগিয়ে গিয়ে পাউরুটি সরাবার বেলচা দিয়ে এক-এক করে রুটিগুলো নামাল। তার পর আরো এগিয়ে গিয়ে পৌঁছল একটা গাছের কাছে। সেটায় ফলেছিল অজস্র আপেল। আপেলগুলো চেঁচিয়ে উঠল, "গাছটা ঝাঁকাও, ঝাঁকাও। আমরা পেকে টুস্‌টুসে হয়ে গেছি।"

মেয়েটি গাছটা ঝাঁকাতে ঝরঝর্‌ করে হাজার-হাজার আপেল ঝরে পড়ল। গাছে একটা আপেলও রইল না। সেগুলো এক জায়গায় জড় করে মেয়েটি আবার এগিয়ে চলল।

যেতে-যেতে যেতে-যেতে শেষটায় সে পৌঁছল ছোট্টো একটা বাড়ির কাছে। বাড়িটার জানলা দিয়ে এক বুড়ি তাঁর দিকে উঁকি মেরে তাকাল। বুড়ির দাঁতগুলো মস্ত বড়ো-বড়ো। তাই দেখে দারুণ ভয় পেয়ে মেয়েটি গেল দৌড়ে পালাতে। বুড়ি চেঁচিয়ে উঠল, "ভয় পাচ্ছিস কেন, বাছা? আমার সঙ্গে থাকবি আয়। আমার ঘর-দোরের কাজ ভালো করে করলে এখানে খুব ভালোই থাকবি। ভালো করে আমার বিছানা পাতিস আর তোশকটা এমন করে ঝাড়িস যতক্ষণ-না পালকগুলো সেখান থেকে উড়তে শুরু করে। পালকগুলো উড়লেই পৃথিবীতে তুষার পড়বে! আমিই হচ্ছি হোল্‌লে ঠাকরুন[১]।

বুড়ির মিষ্টি কথা শুনে মেয়েটির ভয় কেটে গেল। তাই তার কাছে কাজ করতে রাজি হয়ে গেল সে। তার কাজে বুড়ি খুব খুশি। ভালো করে তোশক ঝেড়ে তুষারের পাপড়ির মতো পালক সে ওড়াল। বুড়ির সংসারে সে রইল সুখে-স্বচ্ছন্দে। প্রতিদিন ডিনারে সে খেতে

[১]হেস্‌ শহরে প্রবাদ আছে যে, হোল্‌লে ঠাকরুন বিছানা পাতলেই তুষার ঝরে।

পেল হয় সেদ্ধ নয় ঝলসানো মাংস। কিন্তু কিছুদিন পরে মেয়েটির মন খুব খারাপ হয়ে গেল। প্রথমে সে বুঝতে পারল না এর কারণ কী। কিন্তু শেষে বুঝল বাড়ির জন্য তার মন-কেমন করছে। বাড়ির চেয়ে হোল্‌লে ঠাকরুনের কাছে সে হাজার গুণ আরামে ছিল। তবু তার বাড়ি ফিরতে ইচ্ছে হল। শেষটায় বুড়িকে সে বলল, "এখানে আমি খুব ভালো আছি, তবু কিন্তু বাড়ির জন্যে আমার খুব মন-কেমন করছে; তাই আমি আর থাকতে পারব না। বাড়ির লোকদের কাছে আমার ফিরে যেতেই হবে।"

তার কথা শুনে হোল্‌লে ঠাকরুন বলল, "তুই বাড়ি ফিরতে চাস শুনে আমি খুব খুশি হয়েছি। খুব ভালো করে আমার সেবা-যত্ন করেছিস বলে তোকে আমি নিজেই নিয়ে যাব।" এই-না বলে বুড়ি তার হাত ধরে নিয়ে গেল বিরাট একটা ফটকের কাছে। আর ফটকটা খোলার পর তার নীচে দাঁড়াতেই মেয়েটির উপর ঝর্ ঝর্ করে ঝরে পড়ল অনেক অনেক মোহর। আর মোহরগুলো আটকে গেল তার পোশাকে। ফলে মেয়েটির মাথা থেকে পা পর্যন্ত ঢেকে গেল সোনায়।

হোল্‌লে ঠাকরুন বলল, "তুই খুব পরিশ্রমী বলে এগুলো তোকে দিলাম।" কুয়োয় যে-তকলিটা পড়ে গিয়েছিল সেটাও বুড়ি তাকে ফিরিয়ে দিল। আর সঙ্গে সঙ্গে দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল ফটকটা। মেয়েটি দেখল আবার সে পৃথিবীতে ফিরে এসেছে আর কাছেই রয়েছে তার সৎমার বাড়ি। মেয়েটি বাড়ির উঠনে পৌঁছলে পাম্পের উপরকার মোরগটা চেঁচিয়ে উঠল :

"কোঁকর-কোঁ, কোঁকর-কোঁ
সোনার মেয়ে ফির-লো।"

তার পর মেয়েটি গেল তার সৎমার কাছে। আর তার গা ভর্তি সোনা দেখে সেই সৎমা আর সৎবোন একমুখ হেসে তাকে অনেক আদর করল। কী কী ঘটেছে সব কথা মেয়েই বলল তাদের। সব শুনে সেই সৎমা স্থির করল তার কুচ্ছিত কুঁড়ে মেয়েকেও পাঠাবে মোহর আনতে। তাই তাকে সে পাঠাল সেই কুয়োপাড়ে সুতো কাটতে। তকলিতে রক্ত মাখাবার জন্য মেয়েটা কাঁটা ঝোপে হাত ঢুকিয়ে আঙুল-গুলোয় কাঁটা ফোটাল আর তার পর তকলিটা কুয়োয় ফেলে, দিল ঝাঁপ। ভালো মেয়েটির মতোই সেই সুন্দর মাঠে পৌঁছে একই পথ ধরে সে শুরু

করল যেতে। কিন্তু সেই রুটি-সেঁকার চুল্লির কাছে পৌঁছবার পর পাঁউরুটিগুলো যখন বলল, "আমাদের বার করে নাও, নইলে আমরা পুড়ে যাব, কুঁড়ে মেয়েটা উত্তর দিল, "তোদের জন্যে কালিঝুলি মাখতে আমার বয়ে গেছে।" এই-না বলে সেখান থেকে সে চলে গেল।

যেতে-যেতে যেতে-যেতে সে পৌঁছল সেই আপেল গাছটার কাছে আর আগের মতোই আপেলগুলো চেঁচিয়ে উঠল, "গাছটা ঝাঁকাও, ঝাঁকাও, আমরা পেকে টুস্‌টুসে হয়ে গেছি।"

মেয়েটা বলল, "তাই তো দেখছি। কিন্তু কে জানে, হয়তো অনেকগুলো আমার মাথায় পড়বে।" এই-না বলে সেখান থেকে সে চলে গেল।

হোল্‌লে ঠাকরুনের ছোট্টো বাড়িটার কাছে গিয়ে সে কিন্তু ঘাবড়াল না। কারণ আগেই সে শুনেছিল তার বড়ো-বড়ো দাঁতের কথা। বুড়ির কাজে সে বহাল হয়ে গেল আর প্রথম দিন চেষ্টা করল খুব খেটেখুটে বুড়ির কথামতো কাজ করতে। কারণ বার বার তার মনে পড়েছিল সেই মোহরগুলোর কথা, যেগুলো পরিশ্রমের পুরস্কার হিসেবে সে পাবে। কিন্তু দ্বিতীয় দিনে শুরু হয়ে গেল তার কুঁড়েমি। আর তৃতীয় দিনে ভোরে সে প্রায় উঠতেই চাইল না। ভুলে গেল হোল্‌লে ঠাকরুনের বিছানা ভালো করে পাততে আর তোশক ঝেড়ে পালক ওড়াতে। তার কাজে বিরক্ত হয়ে হোল্‌লে ঠাকরুন তাকে জবাব দিল। কুঁড়ে মেয়েটা তাই শুনে বেজায় খুশি হয়ে ভাবল, 'এবার মোহর বৃষ্টির সময় হয়েছে।'

হোল্‌লে ঠাকরুন তাকে নিয়ে গেল সেই ফটকটার কাছে। কিন্তু সেটার নীচে দাঁড়াতে মোহরের বদলে তার মাথায় ঝরে পড়ল মস্ত বড়ো এক কেতলি আলকাতরা। "তোর কাজের এই পুরস্কার," বলে হোল্‌লে ঠাকরুন বন্ধ করে দিল ফটকটা।

আলকাতরা মেখে কুঁড়ে মেয়েটা বাড়ি ফিরতে পাম্‌পের উপরকার মোরগটা চেঁচিয়ে উঠল :

"কোঁকর-কোঁ, কোঁকর-কোঁ,
নোংরা মেয়ে ফির-লো।"

সেই আলকাতরা ধোয়া গেল না। যতদিন মেয়েটা বেঁচে ছিল ততদিন তার গায়ে লেপটে ছিল সেই আলকাতরা।
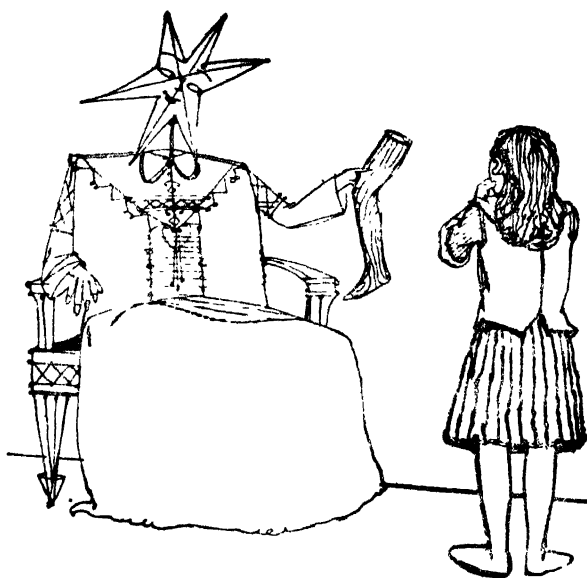
সাতটা দাঁড়কাক

একটি লোকের ছিল সাত ছেলে। কিন্তু কোনো মেয়ে ছিল না। মেয়ের সখ তার অনেকদিনের। শেষটায় তার বউয়ের কোলে এল একটি মেয়ে। লোকটির আনন্দ আর ধরে না। কিন্তু মেয়েটি ভারি ছোট্টোখাট্টো আর ক্ষীণজীবী। তার দুর্বলতার দরুন তাকে নিরিবিলিতে খৃস্টধর্মে দীক্ষা দেওয়া দরকার হয়ে পড়ল। সেই ধর্মীয় অনুষ্ঠানের জন্য ঝর্নার জল আনতে মেয়েটির বাবা তাড়াহুড়ো করে পাঠাল এক ছেলেকে। অন্য ছজন বলল তার সঙ্গে তারাও যাবে। কে আগে জল তুলতে পারে তাই নিয়ে তাদের মধ্যে পড়ে গেল হুড়োহুড়ি। ফলে ঝর্নায় পড়ে গেল মগটা। কী করবে ভেবে না পেয়ে সেখানে তারা দাঁড়িয়ে রইল। ভয় পেল বাড়ি ফিরতে। তারা না ফেরায় বাবা অধৈর্য হয়ে বলে উঠল, "হতভাগাগুলো নিশ্চয়ই আবার বজ্জাতি জুড়েছে।" তার ভয় হল ছোট্ট্রো মেয়েটি হয়তো খৃস্টধর্মে দীক্ষিত হবার আগেই পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবে। তাই সে চেঁচিয়ে উঠল, "ছেলেগুলো যেন দাঁড়কাক হয়ে যায়।" কথাগুলো তার মুখ থেকে খসতে-না-খসতেই তার মাথার উপর আকাশে

সে শুনতে পেল ডানার ঝট্‌পট্‌। তাকিয়ে দেখে সাতটা কুচ্‌কুচে কালো দাঁড়কাক উড়ছে।

এই জাদুর মায়া মা-বাবা কেউই কাটাতে পারল না। সাত ছেলেকে হারিয়ে তাদের খুব দুঃখ হল। কিন্তু তাদের সেই ছোট্টো মেয়েটিকে দিন-কের দিন সুস্থ সবল আর সুন্দর হয়ে উঠতে দেখে পেল খানিক সান্ত্বনা। মেয়েটি বহুকাল জানত না যে, এক সময় তার সাতটি ভাই ছিল। বাবা-মা সযত্নে কথাটা তার কাছে এড়িয়ে গিয়েছিল। কিন্তু একদিন সে শোনে লোকে কানাকানি করছে—সে সুন্দরী হতে পারে কিন্তু তারই দোষে তার সাত ভাই দুর্দশায় পড়েছে। শুনে তার মন খুব খারাপ হয়ে গেল। মা-বাবার কাছে গিয়ে সে প্রশ্ন করল—সত্যিই তার সাত ভাই ছিল কি না; আর থাকলে কী তাদের হয়েছে। কথাটা তখন তার মা-বাবা আর চেপে রাখতে পারল না। কিন্তু তাকে আশ্বাস দিয়ে বলল—সবটাই ভগবানের ইচ্ছে, সে শুধু নিমিত্তমাত্র। ছোট্টো মেয়েটির বিবেক কিন্তু প্রবোধ মানল না। তার মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাল—ভাইদের মুক্ত করা তার পবিত্র কর্তব্য। দিনে রাতে তার মনে আর শান্তি রইল না। তাই চুপি চুপি একদিন সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল তার ভাইদের খোঁজে। মনে-মনে প্রতিজ্ঞা করল বরাতে যাই থাকুক, ভাইদের সে শাপমুক্ত করবে।

সঙ্গে সে নিল ছোট্টো একটা আংটি তার বাবা-মার স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে। আর নিল খিদের জন্য একটা পাউরুটি, তেষ্টার জন্য এক মগ জল, আর ক্লান্ত হলে ভর দেবার জন্য একটা লাঠি।

ঘুরতে-ঘুরতে ঘুরতে-ঘুরতে সে পৌঁছল পৃথিবীর শেষ প্রান্তে। তার পর সে গেল সূর্যের কাছে। কিন্তু সূর্য ভয়ংকর আর অসম্ভব গরম। কচি-কচি ছেলেমেয়েদের সে খেয়ে ফেলে। চট্‌পট্‌ সেখান থেকে পালিয়ে সে গেল চাঁদের কাছে। কিন্তু চাঁদ ভীষণ ঠাণ্ডা, তার উপর নিষ্ঠুর আর শয়তান। ছোট্টো মেয়েটিকে দেখে সে বলল, "হাঁউ-মাউ-খাঁউ, মানুষের গন্ধ পাউ।" তাই মেয়েটি প্রাণপণে ছুট্টে গেল নক্ষত্রদের কাছে। তারা বন্ধুর মতো। স্বভাবটাও দয়ালু। এক-একজন বসেছিল একেকটি ছোটো চেয়ারে।

শুকতারা উঠে তাকে কাঠের ছোট্টো একটি পা দিয়ে বলল, "এই পা না থাকলে কাচের পাহাড়ের মধ্যে তুমি যেতে পারবে না। সেই কাচের পাহাড়েই তোমার ভাইরা আছে।"

সেই কাঠের পা আলোয়ানে জড়িয়ে মেয়েটি গেল কাচের পাহাড়ে। সেখানে পৌঁছে আলোয়ান খুলে কাঠের পা'টা বার করতে গিয়ে মেয়েটি দেখে সেটা নেই—দয়ালু তারার উপহারটা গেছে হারিয়ে। কী তখন সে করে? আন্তরিকভাবে সে চেয়েছিল ভাইদের বাঁচাতে। কিন্তু কাচের পাহাড়ে যাবার চাবিকাঠি সে ফেলেছে হারিয়ে। দয়ালু ছোট্টো বোনটি তখন একটা ছুরি দিয়ে তার কড়ে আঙুলটা কেটে দরজার মধ্যে ঢোকাল আর ভারি খুশি হয়ে দেখল দরজাটা খুলে যেতে।

ভিতরে যেতে একটি বামন তার কাছে গিয়ে বলল, "বাছা কী খুঁজছ?"

মেয়েটি বলল, "খুঁজছি আমার সাত ভাইকে, সেই সাতটি দাঁড়কাককে।"

বামন বলল, "দাঁড়কাক প্রভুরা এখন বাড়ি নেই। তাঁদের না ফেরা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে চাও তো ভেতরে এসো।"

তার পর সেই বামন দাঁড়কাকদের খাবার নিয়ে এল সাতটা ছোটো প্লেটে। সাতটা ছোটো গেলাসে আনল জল। ছোটো বোনটি প্রত্যেক প্লেট থেকে খেল এক টুকরো করে রুটি, প্রত্যেক গেলাসে দিল একবার করে চুমুক। শেষ গেলাসে সে ফেলে দিল সেই ছোট্টো আংটিটা, বাড়ি থেকে যেটা এনেছিল। হঠাৎ সে শুনতে পেল ডানার ঝট্‌পট্‌ শব্দ। বামন বলল, "দাঁড়কাক প্রভুরা উড়তে-উড়তে বাড়ি ফিরছেন।"

ফিরে এসেই তারা বসল তাদের ছোটো-ছোটো প্লেট আর গেলাসের সামনে। তার পর তাদের একজন বলে উঠল, "কে আমার প্লেট থেকে খেয়েছে? কে আমার গেলাসে চুমুক দিয়েছে?—নিশ্চয়ই কোনো মানুষ!" সাতজনের জন চুমক দিয়ে গেলাসে শেষ করতে তলা থেকে গড়িয়ে বেরিয়ে এল আংটিটা।

আংটিটা দেখেই সে চিনল—সেটা তার মা-বাবার। তাই সে চেঁচিয়ে উঠল, "ভগবান আমাদের ছোট্টো বোনটিকে পাঠালে এই জাদুর মায়া থেকে আমরা মুক্তি পেতাম!"

দরজার আড়াল থেকে মেয়েটি এতক্ষণ তাদের কথা শুনছিল। দাঁড়কাকের কামনার কথা শুনে সে বেরিয়ে এল। আর সঙ্গে সঙ্গে সেই সাতটা দাঁড়কাক ফিরে পেল তাদের মানুষের দেহ। তার পর সবাই সবাইকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেল আর মনের আনন্দে ফিরে গেল নিজেদের বাড়িতে।
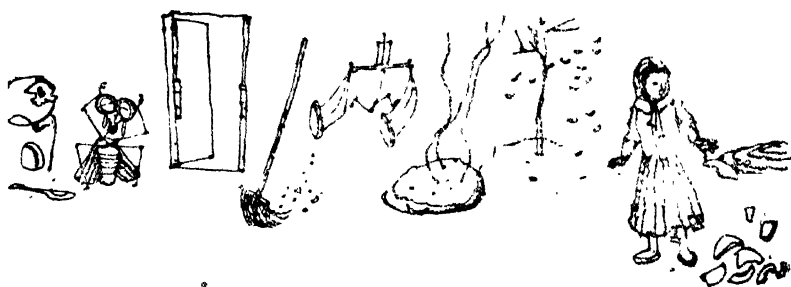
ঘুণপোকা আর নীলমাছি

ছোট্টো একটা ঘুণপোকা আর নীলমাছি এক বাড়িতে থাকত। ডিমের খোলায় রান্না করত তারা ঝোল। একদিন ঘুণপোকা সেই ডিমের খোলার মধ্যে পড়ে ঝলসে গেল। তাই-না দেখে ডাক ছেড়ে কাঁদতে লাগল নীলমাছি। তার কান্না শুনে বৈঠকখানার ছোট্টো দরজাটা ক্যাঁচ্‌ক্যাঁচ্‌ করে প্রশ্ন করল, "নীলমাছি কাঁদছিস কেন?"

নীলমাছি বলল, "আমার ঘুণপোকা ঝলসে গেছে।"

দরজাটা ক্যাঁচ্‌ক্যাঁচ্‌ করে চলল।

ঘরের কোণের ছোট্টো ঝাঁটা প্রশ্ন করল, "দরজাবাবু, ক্যাঁচ্‌ক্যাঁচ্‌ কর কেন?

"কেন করব না?

ঘুণপোকা যে ঝলসেছে,
নীলমাছি যে কাঁদছে।"

তাই-না শুনে ঘ্যাঁস্‌ঘ্যাঁস্‌ ঝাঁটা ঝেঁটিয়ে চলল। তাই দেখে দাঁড়িপাল্লা প্রশ্ন করল, "ঝাঁটা, ঘ্যাঁস্‌ঘ্যাঁস্‌ করে ঝেঁটাস কেন?"

ঝাঁটা উত্তর দিল, "ঝেঁটাব না কেন?

ঘুণপোকা যে ঝলসেছে,
নীলমাছি যে কাঁদছে,
দরজা যে ক্যাঁচ্‌ক্যাঁচ্‌ করছে।"

তাই-না শুনে দাঁড়িপাল্লা বলল, "আমি ছুটব।"

গোবর গাদার পাশ দিয়ে সে ছুটে যেতে গোবর গাদা প্রশ্ন করল, "দাঁড়িপাল্লা, ছুটিস কেন?"

দাঁড়িপাল্লা বলল, "ছুটব না কেন ?

ঘুণপোকা যে ঝলসেছে,
নীলমাছি যে কাঁদছে,
দরজা যে ক্যাঁচ্‌ক্যাঁচ্‌ করছে,
ঝাঁটা যে ঝেঁটাচ্ছে।"

তাই-না শুনে গোবর গাদা বলল, "আমার গায়ে আগুন দিয়ে পাগলের মতো পুড়ব।" বলে সে লাগল জ্বলতে।

গোবর গাদার পাশের ছোট্টো গাছ প্রশ্ন করল, "গোবর গাদা, অমন করে পুড়িস কেন ?"

গোবর গাদা বলল, "পুড়ব না কেন ?

ঘুণপোকা যে ঝলসেছে,
নীলমাছি যে কাঁদছে,
দরজা যে ক্যাঁচ্‌ক্যাঁচ্‌ করছে,
ঝাঁটা যে ঝেঁটাচ্ছে,
দাঁড়িপাল্লা যে ছুটছে।"

তাই-না শুনে গাছ বলল, "আমিও তা হলে কাঁপব।" বলে এমন সে কাঁপতে লাগল যে, ঝরে গেল তার সব পাতা।

ছোট্টো একটি মেয়ে কলসি-কাঁখে জল আনছিল। গাছকে কাঁপতে দেখে সে প্রশ্ন করল, "গাছ, অমন করে কাঁপিস কেন ?"

গাছ বলল, "কাঁপব না কেন ?

ঘুণপোকা যে ঝলসেছে,
নীলমাছি যে কাঁদছে,
দরজা যে ক্যাঁচ্‌ক্যাঁচ্‌ করছে,
ঝাঁটা যে ঝেঁটাচ্ছে,
দাঁড়িপাল্লা যে ছুটছে,
গোবর গাদা যে জ্বলছে।"

তাই-না শুনে মেয়েটি বলল, "আমি তা হলে কলসিটা ভাঙব।" বলে কলসিটা মাটিতে আছড়ে সে টুকরো-টুকরো করে ফেলল।

ছোট্টো নদী প্রশ্ন করল, "কলসিটা ভাঙিস কেন ?"

মেয়েটি বলল, "ভাঙব না কেন ?

ঘুণপোকা যে ঝলসেছে,
নীলমাছি যে কাঁদছে,
দরজা যে ক্যাঁচ্‌ক্যাঁচ্‌ করছে,
ঝাঁটা যে ঝেঁটাচ্ছে,
দাঁড়িপাল্লা যে ছুটছে,
গোবর গাদা যে জ্বলছে,
গাছটা যে কাঁপছে।"

তাই-না শুনে ছোট্টো নদী বলল, "আমি তা হলে উপচে পড়ব।" বলে ছোট্টো নদী এমন বাণ ডাকালে যে, তাতে সব-কিছু গেল ভেসে— মেয়ে, গাছ, গোবর গাদা, দাঁড়িপাল্লা, ঝাঁটা, দরজা, নীলমাছি, আর ঘুণপোকা।

বেড়াল আর ইঁদুরের সংসার

এক বেড়ালের সঙ্গে এক ইঁদুরের একবার আলাপ হয়। বেড়ালটা এমন আদর আদিখ্যেতা দেখায় যে, শেষপর্যন্ত ইঁদুরটা তার সঙ্গে একই ঘরে সংসার পাততে হয় রাজি।

বেড়াল বলল, "শীতকালের জন্যে আমাদের খাবার জমিয়ে রাখতেই হবে। নইলে খিদের জ্বালায় মরব। তুই ইঁদুর, তাই যেখানে খুশি যেতে পারিস না। বেশি ঘোরাঘুরি করলে শেষপর্যন্ত জাঁতিকলে মারা পড়বি।"

বেড়ালের উপদেশমতো ছোটো এক ডিবে চবি কেনা হল। কিন্তু

কোথায় সেটা তুলে রাখা যায় তারা ভেবে পেল না। শেষটায় অনেক ভেবেচিন্তে বেড়াল বলল, "মনে হচ্ছে গির্জের চেয়ে নিরাপদ আর কোনো জায়গা নেই। গির্জেয় কারুর নেই চুরি করার সাহস। বেদীর নীচে এটা আমরা রেখে দেবো। সত্যিকারের দরকার না পড়লে ছোঁব না।"

সেই নিরাপদ জায়গায় ডিবেটা রাখা হল। কিন্তু কয়েকদিন যেতে-না-যেতেই বেড়ালের খুব লোভ হল চবিটা চেখে দেখার। তাই ইঁদুরকে সে বলল, "শোন ভাই ইঁদুর, আমার বোনপোর ধর্মমা হবার জন্যে ওরা আমায় ধরেছে। হালে আমার বোনের ছেলে হয়েছে। ধবধবে রঙ, তার ওপর বাদামী ছোপ। তার নামকরণের দিন আমায় গিয়ে পবিত্র জলের গামলা ধরতে হবে। আমি গেলে বাড়ি থেকে তুই বেরুস নি। ঘর-সংসার আগলাবি।"

ইঁদুর বলল, "ঠিক আছে। যাবে বৈকি। শুধু ভালো ভালো জিনিস খাবার সময় আমার কথাটা ভেবো। নামকরণের মিষ্টি মদের কয়েক ফোঁটা চাখবার আমারও খুব ইচ্ছে।"

আসলে বেড়ালের কথাগুলোর পুরোটাই মিথ্যে। তার কোনো বোন-টোন ছিল না। কেউই তাকে ধর্মমা হতে বলে নি। বেড়ালটা সোজা গির্জেয় হাজির হয়ে চোরের মতো চুপি চুপি সেই চর্বির ডিবের কাছে গেল। তার পর সেটার গা-দিয়ে গড়ানো সব চর্বি চেটেপুটে করল শেষ। তার পর সে শহরের বাড়ির ছাদে-ছাদে ঘুরে, কোথায় কী চুরি-টুরি করা যায় উঁকিঝুঁকি মেরে দেখে রোদে টান-টান হয়ে শুয়ে চবির ডিবেটার কথা ভাবতে-ভাবতে নিজের গোঁফ চাটতে লাগল। সন্ধেয় ফিরল বাড়ি।

ইঁদুর বলল, "কেমন আমোদ-আহ্লাদ হল?"

বেড়াল বলল, "মন্দ নয়।"

"ছেলের নাম কি হল?"

"ছাল-ওঠা," রসকষহীন স্বরে বলল বেড়াল।

ইঁদুর বলল, "ছাল-ওঠা? কী বেখাপ্পা নাম! এটা কি ওদের পদবি?"

বেড়াল বলল, "বেখাপ্পা কেন? তোর ঠাকুর্দার নাম ছিল তো রুটি-চোর। আশাকরি অর চেয়ে এটা খারাপ নাম নয়।"

কিছুদিন যেতে-না-যেতেই আবার বেড়াল লোভে উস্‌খুস্ করে উঠল। বলল, "ইঁদুর ভাই! আজ আবার তোকে একলা বাড়ি

আগলাতে হবে। দ্বিতীয়বার ধর্মমা হবার ডাক পড়েছে। বাচ্ছাটার গলার চার দিকে সাদা দাগ। আমাকে যেতেই হবে।"

ভালোমানুষ ইঁদুর সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেল। শহরের দেয়ালের উপর দিয়ে চোরের মতো চুপি চুপি গির্জেতে পৌঁছে চেটে ডিবের অর্ধেকটা শেষ করে ফেলল বেড়াল।

তার পর বলল, "একলা-একলা খাবার মতো সুখ আর নেই।" মনে হল সেদিনকার মতো কাজ হাসিল করে সে বেজায় তৃপ্তি পেয়েছে।

সে ফিরলে ইঁদুর জিগ্‌গেস করল, "বাচ্চার নাম কী হল ?"

বেড়াল বলল, "আধ-খালি।"

ইঁদুর বলল, "আধ-খালি ? জীবনে তো এরকম নাম শুনি নি। হলফ করে বলতে পারি পাঁজিতে এরকম নাম নেই।"

অল্প কদিন পরে বেদীর নীচেকার সেই ডিবের কথা মনে পড়তেই বেড়ালের জিভে আবার জল এল। ইঁদুরকে বলল, "ভালো সব-কিছুই তিন-তিনটে করে হয়। তাই তৃতীয়বার আমাকে ধর্মমা হতে হবে। বাচ্ছাটা কুচকুচে কালো, শুধু কয়েক জায়গায় সাদা সাদা ছোপ। আর কোথাও একগাছা সাদা লোম নেই। এরকমটা কালেভদ্রে ঘটে। তাই আর-এক বার আমাকে বেরুতে হচ্ছে।"

চিন্তিতভাবে ইঁদুর বলল, "ছাল-ওঠা। আধ-খালি। এই অদ্ভুত নামগুলোর মাথামুণ্ডু বুঝছি না।"

"সারাদিন বাড়িতে ছাই রঙের কোট পরে আর লম্বা ল্যাজ নিয়ে বসে থাকতে থাকতে যত সব উদ্ভট ভাবনা তোর মাথায় আসে। কখনো বাইরে না বেরুলে এরকমটাই হয়।"

বেড়াল বেরিয়ে যেতে সব-কিছু ঝেড়ে-মুছে বাড়িটা ঝকঝকে তক-তকে করে তুলল ইঁদুর। পেটুক বেড়াল এদিকে চেটেপুটে সাফ করে দিল ডিবেটা। মনে মনে বলল, 'আঃ! শেষ হলে পরেই শান্তি।' সন্ধেয় নাদুস্-নুদুস্ চেহারা নিয়ে সে বাড়ি ফিরল। সঙ্গে সঙ্গে ইঁদুর জিগ্‌গেস করল তৃতীয় বাচ্ছাটার কী নামকরণ হল।

বেড়াল বলল, "নামটা নিশ্চয়ই তোর পছন্দসই হবে না। নাম দেওয়া হয়েছে সব-খালি।"

ইঁদুর বলে উঠল, "সব-খালি! ছাপার অক্ষরে এরকম নাম তো

কখনো দেখি নি। সব-খালি—কথাটার মানে কী?" মাথা নাড়িয়ে শরীরটা গোল করে পাকিয়ে সে ঘুমিয়ে পড়ল।

এর পর থেকে কেউ আর বেড়ালকে নামকরণের নেমন্তন্ন করে না। কিন্তু শীত পড়ার পর খাবার-দাবার টান পড়তে গির্জেয় তাদের সেই জমানো চবির ডিবেটার কথা ইঁদুরের মনে পড়ল। বলল, "চল ভাই বেড়াল, আমাদের সেই জমিয়ে রাখা চবির ডিবেটা চেকে আসা যাক।"

বেড়াল বলল, "বেশ কথা। কিন্তু গিয়ে দেখবি চাখবার কিছু নেই। জানলা দিয়ে তোর ছোটো জিভ বার করার মতোই পণ্ডশ্রম হবে।"

গির্জেয় গিয়ে যথাস্থানেই তারা দেখল ডিবেটা, কিন্তু একদম সেটা ফাঁকা।

ইঁদুর বলল, "এবার পরিষ্কার বুঝলাম কী হয়েছে। বাস্তবিকই তুমি দেখছি আসল বন্ধু। ধর্ম্মমা হবার নাম করে এসে সবটাই তুমি গোগ্রাসে গিলেছ। প্রথমে চেটেছিলে বাইরেটা। তার পর চেটেপটে করেছিলে আধ-খালি। আর তার পর—"

বেড়াল চেঁচিয়ে বলল "বকবকানি থামাবি? আর একটা কথা খসালেই তোকেও সাবাড় করব।"

বেচারা ইঁদুরের জিভের ডগায় ততক্ষণে কিন্তু এসে গেছে—"সব-খালি!" সঙ্গে সঙ্গে বেড়াল তার উপর ঝাঁপিয়ে কুড়্‌মুড়্‌ করে চিবিয়ে তাকে গিলে ফেলল।

দেখলে তো—একেই বলে সংসার!

গান গাওয়া হাড়

এক সময় এক দেশে একটা বুনো শুয়োরের দারুণ আতংক ছড়িয়ে পড়ে। চাষীদের ক্ষেতের ফসল সেটা ছারখার করে দিত, ছাগল-ভেড়া গোরু-মোষ মারত আর শিঙ দিয়ে ফালা-ফালা করে দিত লোকজনের শরীর। জন্তুটাকে যে মারতে পারবে তাকে অনেক পুরস্কার দেওয়া হবে বলে রাজা ঘোষণা করলেন। কিন্তু যে বনে শুয়োরটা থাকত কেউ সেখানে সাহস করে গেল না। শেষটায় রাজা ঘোষণা করলেন জন্তুটাকে যে ধরতে কিংবা মারতে পারবে তার সঙ্গে রাজকন্যের বিয়ে দেবেন। সেই দেশে এক গরিব লোকের দুই ছেলে ছিল। দুজনেই তারা জানাল সেই অসমসাহসিক কাজটা করতে তারা প্রস্তুত। বড়ো ছেলেটি খুব ধর্ত। নেহাত বড়াই করেই কথাটা সে জানাল। ছোটোটি ছিল হাবাগোবা গোছের। কথাটা সে জানাল তাতে লোকের উপকার হবে বলে। রাজা আদেশ দিলেন বনের দু পাশ থেকে তাদের দুজনকে এগুতে। তা হলে

জন্তুটা তাদের নজর এড়িয়ে যেতে পারবে না। বড়ো ভাই গেল সকালে, ছোটো গেল সন্ধেয়। বনে যেতে-যেতে ছোটো ভাইয়ের সঙ্গে দেখা হল ছোট্টোখাট্টো একটি লোকের সঙ্গে। তার হাতে ছিল একটা বর্শা।

লোকটি বলল, "এই বর্শাটা নাও। তোমার মন খুব ভালো। তাই এটা দিলাম। এই বর্শা দিয়ে বুনো শুয়োরটাকে আক্রমণ করলে তুমি বিপদে পড়বে না। তোমার কোনো ক্ষতি জন্তুটা করতে পারবে না।"

সেই ছোট্টোখাট্টো মানুষটিকে ধন্যবাদ দিয়ে বর্শা নিয়ে নির্ভীক মনে ছোটো ভাই এগিয়ে চলল। আর খানিক পরেই দেখল শুয়োরটা তার দিকে তেড়ে আসছে। রাগে গর্‌গর্‌ করতে-করতে এমন জোরে জন্তুটা সেই বর্শার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল যে সঙ্গে সঙ্গে তার বুকটা গেল দু টুকরো হয়ে। রাজার কাছে নিয়ে যাবার জন্য জন্তুটাকে কাঁধে নিয়ে সে ফিরল।

বনের অন্য পাশ দিয়ে বেরিয়ে আসার সময় তার নজরে পড়ল একটা বাড়ি। বাড়ির বাইরে বহু লোক মদ-টদ খেয়ে হৈ-হল্লা ফুর্তি-টুর্তি করেছে। তার বড়ো ভাই ছিল সেখানে। ভেবেছিল শুয়োরটার সঙ্গে লড়াই করার আগে মদ খেয়ে সাহস সঞ্চয় করে নেবে। ভেবেছিল কিছুতেই জন্তুটা তাকে ফাঁকি দিয়ে পালাতে পারবে না। কিন্তু বুনো শুয়োরের মৃতদেহ কাঁধে নিয়ে ছোটো ভাইকে আসতে দেখে হিংসেয় সে জ্বলে উঠল। তাকে ডেকে বলল, "ওরে, এখানে আয়। বিশ্রাম কর। মদ-টদ খা।"

ছোটো ভাইটির মন খুব সরল। তাই তার সন্দেহ হল না দাদার মনে একটা কুমতলব আছে। সেখানে গিয়ে সব কথা সে জানাল : সেই ছোট্টোখাট্টো লোকটির বর্শা দেবার আর সেটা দিয়ে বুনো শুয়োরকে মারার কথা।

সেই সরাইখানায় বড়ো ভাই তাকে আটকে রাখল রাত পর্যন্ত। তার পর দুজনেই পড়ল বেরিয়ে। যেতে-যেতে গভীর অন্ধকারে তারা পৌঁছল একটা নদীর উপরকার সেতুতে। বড়ো ভাই বলল ছোটোভাইকে আগে-আগে যেতে। আর যেই-না ছোটো ভাই সেতুর মাঝখানে পৌঁছেছে সঙ্গে সঙ্গে বড়ো ভাই তাকে পিছন থেকে ছোরা মেরে দিল নদীর মধ্যে ফেলে। তার পর তাকে সেতুর নীচে কবর দিয়ে, বুনো শুয়োরের মৃতদেহ নিয়ে গিয়ে রাজাকে বলল সেটাকে মেরেছে সে। তাই তার সঙ্গে রাজা তার

মেয়ের বিয়ে দিলেন। ছোটো ভাই না ফেরায় বড়ো ভাই বলল, বুনো শুয়োরটা আগে নিশ্চয়ই তাকে টুকরো-টুকরো করে ফেলেছিল। সবাই তার কথা বিশ্বাস করল।

কিন্তু কিছুই ভগবানের চোখে এড়িয়ে যায় না। তাই এই জঘন্য অপরাধের কথা জানাজানি হয়ে গেল। অনেক বছর পরে এক রাখাল সেই সেতুর উপর দিয়ে যাচ্ছিল তার ভেড়ার পাল নিয়ে। যেতে-যেতে সে দেখে নীচেকার বালিতে পড়ে রয়েছে তুষার-ধবল একটা হাড়। সে ভাবল হাড়টা দিয়ে তার বাঁশির মুখটা ভালো করে বাঁধানো যাবে। নীচে নেমে হাড়টা কুড়িয়ে সেটা দিয়ে সে বাঁধলো তার বাঁশির মুখ। বাঁশিতে ফুঁ দিতেই রাখালকে দারুণ অবাক করে হাড়টা আপনা থেকেই গেয়ে উঠল :

"রাখালভাই শুনবে শোনো
আমার হাড় বাঁশিতে জানো ?
এখানে দাদা মেরেছিল
সেতুর তলে পুঁতেছিল।
বুনো শুয়োর দিয়ে পায়
রাজার মেয়ে রাজ্যসভায়।"

রাখাল বলে উঠল, "বাঁশিটা তো ভারি সুন্দর, আপনা থেকেই গাইতে পারে। রাজার কাছে এটাকে নিয়ে যাই তো।"

রাজার কাছে রাখাল পৌঁছতে বাঁশিতে আবার ঐ গানটা গেয়ে উঠল। গানের প্রতিটি কথা বুঝতে পেরে রাজা আদেশ দিলেন সেতুর তলার মাটি খুঁড়তে। আর মাটি খুঁড়তেই বেরিয়ে পড়ল নিহত ছোটো ভাইয়ের কঙ্কাল।

বড়ো ভাই তার অপরাধ অস্বীকার করতে পারল না। একটা থলিতে ভরে সেটার মুখ সেলাই করে তাকে ডুবিয়ে মারা হল। আর ছোটো ভাইয়ের হাড় গির্জের অঙ্গনে নিয়ে গিয়ে রাখা হল খুব সুন্দর একটি কবরে।

জাঁতাওয়ালার মেয়ে

এক সময় এক জাঁতাওয়ালা ছিল। সে গরিব হলেও তার মেয়েটি ছিল সুন্দরী। একদিন রাজার সঙ্গে সে কথা বলছিল। রাজাকে অবাক করে দেবার জন্য হঠাৎ সে বলে উঠল, "আমার মেয়ে খড় থেকে সোনার সুতো কাটতে পারে।"

রাজা বললেন, "তোমার কথামতো তোমার মেয়ে যদি সত্যি সত্যিই অমন চালাক হয়, তা হলে কাল তাকে আমার দুর্গে নিয়ে এসো। তার এই আশ্চর্য ক্ষমতা আমি পরখ করে দেখতে চাই।"

পরদিন জাঁতাওয়ালা মেয়েটিকে দুর্গে নিয়ে এল। রাজা তাকে নিয়ে গেলেন খড়-ভর্তি এক ঘরে। তার পর তাকে একটা চরকা দিয়ে বললেন, "কাজ শুরু করে দাও। সারা রাত চরকা কেটে কাল সকালের মধ্যে এই খড়গুলো থেকে সোনার সুতো বার করতে না পারলে তোমার প্রাণদণ্ড হবে।" কথাগুলো বলে রাজা নিজেই দরজা বন্ধ করে দিলেন। সেই ঘরে মেয়েটি রইল একা।

সেখানে বসে থাকতে-থাকতে মেয়েটি ভেবে পেল না কী করবে। কারণ সত্যিই সে জানত না খড় থেকে কী করে সোনার সুতো বানাতে হয়। শেষটায় দারুণ ভয় পেয়ে সে কাঁদতে শুরু করে দিল। এমন

সময় হঠাৎ দরজা খুলে ঘরে এল ছোটো একটি মানুষ। সে বলল, "শুভ সন্ধ্যা। তুমি কাঁদছ কেন?"

মেয়েটি বলল, "এই খড় থেকে আমায় সোনার সুতো বার করতে হবে। কিন্তু জানি না কী করে সেটা করতে হয়।"

ছোট্টো মানুষটি বলল, "তোমার হয়ে আমি যদি সোনার সুতো কেটে দি তা হলে আমাকে কী দেবে?"

মেয়েটি বলল, "আমার এই ওড়নাটা।"

ছোট্টো মানুষটি সেই ওড়না নিয়ে চরকার সামনে বসল। আর সঙ্গে সঙ্গে গুন্-গুন্ শব্দ করে চরকা ঘুরতে লাগল পুরোদমে। সারা রাত ধরে খড় থেকে সে সোনার সুতো কাটল। সকালে সব খড় হল শেষ আর সব মাকু ভরে গেল সোনার সুতোয়।

সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে রাজা এলেন। সোনার সুতো দেখে তাঁর আনন্দ আর ধরে না। কিন্তু সোনা দেখে সোনার লোভ তাঁর আরো বেড়ে গেল। তাই মেয়েটিকে তিনি নিয়ে গেলেন আরো বড়ো একটা খড়-ভর্তি ঘরে। তার পর বললেন রাতের মধ্যে সেই খড় থেকে সোনার সুতো বানাতে না পারলে তার হবে প্রাণদণ্ড।

মেয়েটি হতাশ হয়ে কাঁদতে শুরু করল। কিন্তু আবার দরজা খুলে গেল আর এল সেই ছোট্টো মানুষটি। সে বলল, "তোমার হয়ে এই খড় থেকে আমি যদি সোনার সুতো কেটে দি তা হলে আমায় কী দেবে?"

মেয়েটি বলল, "আমার আঙুলের এই আংটি।"

ছোট্টো মানুষটি আংটিটা নিয়ে চরকার সামনে বসল। আর সঙ্গে সঙ্গে গুন্-গুন্ করে উঠল চরকা। সকালে সব খড় হল শেষ আর-সব মাকু ভরে গেল ঝকঝকে সোনার সুতোয়।

সোনার সুতো দেখে রাজার আনন্দ আর ধরে না। কিন্তু সোনার লোভ তাঁর মিটল না। তাই মেয়েটিকে তিনি নিয়ে গেলেন আরো বড়ো একটা খড়-ভর্তি ঘরে। তার পর বললেন, "আজ রাতের মধ্যে এই সমস্ত খড় থেকে সোনার সুতো কাটতে পারলে তোমাকে আমি বিয়ে করব।" মনে-মনে তিনি ভাবলেন, 'তুচ্ছ জাঁতাওয়ালার মেয়ে হলে হবে কি, এর চেয়ে ধনী বউ কোথায় পাব?'

মেয়েটি ঘরে যখন একলা বসে, তৃতীয়বার এল সেই ছোট্টো

মানুষটি। সে বলল, "তোমার হয়ে এই খড় থেকে আমি যদি সোনার সুতো কেটে দি তা হলে আমায় কী দেবে?"

মেয়েটি বলল, "দেবার মতো আমার তো আর কিছু নেই।"

ছোট্টো মানুষটি বলল, "রানী হবার পর তোমার যে প্রথম সন্তান হবে—কথা দাও, তাকে আমায় দেবে।"

বিপদ থেকে উদ্ধারের আর কোনো আশা না দেখে মেয়েটি কথা দিল আর ছোট্টো মানুষটি আবার খড় থেকে বানিয়ে দিল সোনার সুতো। পরদিন সকালে সোনার সুতো দেখার সঙ্গে সঙ্গে রাজা আদেশ দিলেন বিয়ের ভোজের আয়োজন করতে। আর তার পর জাঁতাওয়ালার সুন্দরী মেয়ে হয়ে গেল রানী।

এক বছর পরে তার কোলে এল ফুটফুটে একটি শিশু। সেই ছোট্টো মানুষটির কাছে তার সেই প্রতিজ্ঞার কথা তখন আর তার মনে ছিল না। হঠাৎ একদিন ঘরে এসে সে বলল, "তুমি যাকে দেবে বলে কথা দিয়েছিলে এবার তাকে দাও।"

রানী তখন ভীষণ ভয় পেয়ে তাকে বলল তার সন্তানের বদলে নিজের সমস্ত হীরে-জহরত নিতে। কিন্তু ছোট্টো মানুষটি বলল, "তোমার সব হীরে-জহরতের চেয়ে আমার কাছে জীবন্ত শিশুর দাম অনেক বেশি।" তার কথা শুনে রানী হাউমাউ করে কাঁদতে লাগল। রানীর কান্না দেখে সেই ছোট্টো মানুষটির দয়া হল। সে বলল, "আমি তোমাকে তিনদিন সময় দিলাম। তার মধ্যে আমার নাম অনুমান করতে পারলে শিশুকে তুমি রাখতে পারবে।"

সারা রাত জেগে রানী ভাবতে লাগল নানা নাম। রাজ্যের সর্বত্র সে দূত পাঠাল নতুন-নতুন নাম জোগাড় করতে। পরদিন ছোট্টো মানুষটি এলে রানী বললেন, "ক্যাস্‌পার, মেল্‌চোর, বাল্‌জোর।" ছোট্টো মানুষটি মাথা নেড়ে বলল, "না, না, না।"

দ্বিতীয় দিন রানী আবার দূত পাঠাল নতুন-নতুন মজার মজার অদ্ভুত-অদ্ভুত সব নাম জোগাড় করতে। আর ছোট্টো মানুষটি এলে সে বলল, "কাগতাড়ুয়া, উটকপালে, ন্যাতা-গোবরা।" ছোট্টো মানুষটি মাথা নেড়ে বলল, "না, না, না।"

তৃতীয় দিন একজন দূত ফিরে এসে বলল কোনো নতুন নাম সে জোগাড় করতে পারে নি। কিন্তু সে যখন বনের পাশে পাহাড়ের কাছে

দাঁড়িয়েছিল, শেয়াল যেখানে খরগোশকে বলেছিল 'গুডনাইট', সেখানে সে দেখে ছোট্টো একটা বাড়ি। বাড়িটার সামনে আগুন জ্বলছিল। আর সেই আগুনের চার পাশে একপায়ে লাফাতে-লাফাতে একটা অদ্ভুত চেহারার বামন তারস্বরে চেঁচাচ্ছিল—

"আজ পাকাব ডাল-রুটি, কালকে সম্বার,
পরশু যাব রানীর কাছে, আনব ছেলে তার।
কেউ না জানে আমার নাম—হাঃ-হাঃ-হাঃ হিং
আমি রামখেলতিলকসিং।"

নামটা শুনে, বুঝতেই পারছ, রানীর আনন্দ আর ধরে না। কয়েক মিনিট পরে বামন এসে যখন প্রশ্ন করল, "রানী, আমার নাম কি?" রানী প্রথমে বললেন, "কুঁজো।"

"হল না।"

"বেঁটে-বাঁটকুল।"

"হল না।"

"তা হলে কি তোমার নাম রামখেলতিলকসিং?"

"কে বললে? কে বললে? নিশ্চয়ই শয়তান এসে বলে গেছে!" এই-না বলে তারস্বরে চেঁচাতে লাগল সেই ছোট্টো মানুষটি। তার পর দারুণ রেগে এমন জোরে তার ডান পা ঠুকল যে, সে গেল পড়ে। তার পর বাঁ পা ধরে নিজেকে সামলাতে গিয়ে সে হয়ে গেল দু টুকরো।

জেলে আর তার বউ

এক সময় এক জেলে ছিল। সমুদ্রের কাছে ছোট্টো এক নোংরা গোয়াল-ঘরে বউকে নিয়ে সে থাকত। প্রতিদিন সে যেত মাছ ধরতে।

একদিন স্বচ্ছ জলের নীচে তাকিয়ে ছিপ ধরে বসে আছে।

এমন সময় তার ছিপের সুতোয় টান পড়ল আর দেখতে-দেখতে সেটা চলে গেল সমুদ্রের একেবারে তলায়। তার পর সুতো টেনে তুলে সে দেখে সেটার শেষ মাথায় রয়েছে প্রকাণ্ড একটা পোনামাছ। পোনা-মাছটা তাকে বলল, "জেলে, শোনো। দোহাই আমাকে মেরো না। আমি পোনামাছ নই। আমি রাজপুত্তুর, জাদুর মায়ায় এই দশা। আমাকে মেরে তোমার লাভ কী? দেখবে আমার মাংস খাবার মতো নয়। আমাকে জলে ছেড়ে দাও, সাঁতরে চলে যাই।"

জেলে বলল, "অতশত কথায় আমার কাজ নেই। যে-পোনামাছ কথা বলতে পারে তাকে রাখার কল্পনাও করতে পারি না।" এই-না বলে জেলে তাকে স্বচ্ছ জলে ছেড়ে দিল। সাঁতরে চলে গেল পোনামাছটা আর তার পিছনে ফুটে উঠল রক্তের একটা রেখা। জেলে ফিরে গেল তার গোয়াল-ঘরে বউয়ের কাছে।

তার বউ বলল, "হ্যাঁগো, আজ তুমি কিছুই ধর নি?"

জেলে বলল, "না—মানে ইয়ে—একটা পোনামাছ ধরেছিলাম। কিন্তু সেটা বলল সে পোনামাছ নয়, সে রাজপুত্তুর—জাদুর মায়ায় তার ঐ দশা। তাই তাকে ছেড়ে দিয়েছি।"

জেলের বউ প্রশ্ন করল, "তার কাছে কোনো বর চাও নি?"

জেলে বলল, "না। কী বর চাইব?"

জেলের বউ বলল, "এই নোংরা গোয়াল-ঘরটায় থাকতে ভারি অসুবিধে। তার কাছে ছোট্টো সুন্দর একটা কুঁড়েঘর চাওয়া উচিত ছিল। ফিরে গিয়ে তাকে ডাকো। আমাদের একটা ছোট্টো কুঁড়েঘর চাই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস নিশ্চয়ই সে-ব্যবস্থা সে করবে।"

জেলে বলল, "কিন্তু এটা সে করতে যাবে কেন?"

তার বউ বলল, "তুমি তাকে ধরেছিলে তার পর দিয়েছিলে ছেড়ে। নিশ্চয়ই এটা সে করবে। এক্ষুনি যাও।

জেলের যাবার বিশেষ ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু বউকে সে চটাতে চাইল না। তাই সে আবার ফিরে গেল সমুদ্রের তীরে।

সেখানে ফিরে এসে সে দেখে সমুদ্রের রঙ হয়ে উঠেছে সবুজ আর হলদে। আগের মতো শান্ত চেহারা আর তার নেই। সমুদ্রের তীরে দাঁড়িয়ে সে বলল:

"সমুদ্রের মাছ, আছ তুমি কোথায়,
বউটি যে কান দেয় না আমার কোনো কথায়।"

সেই পোনামাছটা সাঁতরে এসে বলল, "তোমার বউ কি চায়?"

জেলে বলল, "একটু আগে তোমায় ধরেছিলাম। তাই আমার বউ বলেছে তোমার কাছে একটা বর চাওয়া আমার উচিত ছিল। আমাদের গোয়াল-ঘরটায় সে আর থাকতে চায় না। সে চায় একটা কুঁড়েঘর।"

পোনামাছ বলল, "ফিরে যাও। গিয়ে দেখবে সেটা তোমার বউ পেয়ে গেছে।"

জেলে ফিরে গিয়ে দেখে গোয়াল-ঘরে তার বউ নেই। সেটার জায়গায় রয়েছে একটা কুঁড়েঘর আর কুঁড়েঘরের দরজার সামনে একটা বেঞ্চিতে তার বউ বসে। বউ তার হাত ধরে বলল, "ভেতরে এসে দেখ। এটা আগের চেয়ে অনেক ভালো নয় কি?"

তারা ভিতরে গেল। গিয়ে দেখে সেই কুঁড়েঘরটার মধ্যে রয়েছে একফালি বারান্দা, ছোট্টো সুন্দর একটা বসার ঘর, একটা শোবার ঘর— সেখানে তাদের বিছানা পাতা—একটা রান্নাঘর আর একটা ভাঁড়ার ঘর। সব ঘরগুলোই একেবারে নিখুঁত। আর রয়েছে টিন আর পেতলের প্রচুর বাসনপত্র। আর যাবতীয় সব দরকারি জিনিস। দেখে, ছোট্টো একটা উঠোনও রয়েছে। সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে অনেক হাঁস আর মুরগি।

আর দেখে ছোট্টো একটা বাগান। সেখানে ফলে রয়েছে হরেকরকম তরিতরকারি আর ফল।

তার বউ বলল, "কেমন—খুব সুন্দর আর পরিপাটি নয়?"

জেলে বলল, "হ্যাঁ, এখানে আমরা খুব সুখেই থাকব।"

তার বউ বলল, "সেটা দেখা যাবে।"

এই-না বলে রাতের খাবার খেয়ে তারা শুতে গেল।

হপ্তাখানেক, হপ্তাদুয়েক তাদের খুব ভালোই কাটল। তার পর এক দিন জেলের বউ বলল, "ওগো শোনো—এই কুঁড়েঘরটা বেজায় ছোটো, উঠোন আর বাগানটাও বড়োসড়ো নয়। পোনামাছটা এর চেয়েও বড়ো একটা বাড়ি দিতে পারে। আমি একটা পাথরের মস্ত বড়ো প্রাসাদে থাকতে চাই। পোনামাছটার কাছে গিয়ে বল আমাদের একটা প্রাসাদ দিতে।"

জেলে বলল, "বউ, এই কুঁড়েঘরটা তো খুবই ভালো। প্রাসাদে থাকার কি দরকার আমাদের?"

তার বউ বলল, "বাজে বকবক কোরো না। পোনামাছটার কাছে যাও। নিশ্চয়ই এটার ব্যবস্থা সে করে দিতে পারবে।"

জেলে বলল, "না বউ। এই তো সেদিন পোনামাছ আমাদের কুঁড়েঘরটা দিয়েছে। তার কাছে আবার যেতে আমার ইচ্ছে করছে না। আমার কথা শুনে সে চটে যেতে পারে।"

তার বউ রেগে চেঁচিয়ে উঠল, "গিয়েই দেখ না। এটা সে পারে আর খুশি হয়েই এটা সে করবে। গিয়েই দেখ না।"

জেলের মন খারাপ হয়ে গেল। কিছুতেই যেতে তার ইচ্ছে করল না। আপন মনে বিড়্‌বিড়্ করে সে বলতে লাগল, 'এটা ঠিক নয়; এটা ঠিক নয়।' কিন্তু শেষপর্যন্ত যেতে তাকে হলই।

সমুদ্রের তীরে পেঁীছে সে দেখে জলের রঙ গাঢ় নীল আর বেগুনি—আগের মতো সবুজ আর হলদে নয়। কিন্তু জল তখনো শান্ত। সমুদ্রের তীর ঘেঁষে দাঁড়িয়ে সে বলল :

"সমুদ্রের মাছ আছ তুমি কোথায়,
বউটি যে কান দেয় না আমার কোনো কথায়।"

পোনামাছ বলল, "কী সে চায়?"

বেশ ঘাবড়ে গিয়ে জেলে বলল, "সে একটা পাথরের প্রাসাদে থাকতে চায়।"

পোনামাছ বলল, "ফিরে যাও। গিয়ে দেখবে পাথরের প্রাসাদের দোরগোড়ায় সে দাঁড়িয়ে রয়েছে।"

জেলে বাড়ি ফিরে চলল। সেখানে পৌঁছে সে দেখে পাথরের প্রকাণ্ড একটা প্রাসাদ আর সিঁড়িতে তার বউ দাঁড়িয়ে। জেলের হাত ধরে তার বউ বলল, "আমার সঙ্গে ভেতরে চলো।" জেলে চলল তার বউয়ের সঙ্গে। প্রাসাদের ভিতরে গিয়ে দেখে মার্বেল পাথরের বাঁধানো মস্ত বড়ো একটা বারান্দা। অসংখ্য চাকর বিরাট দরজাগুলো খুলে দিচ্ছে। সুন্দর-সুন্দর রঙের দেয়ালগুলো ঝকমক করছে। ঘরগুলোর মধ্যে সোনালী গিল্‌টি করা অসংখ্য চেয়ার আর টেবিল। ছাত থেকে ঝুলছে স্ফটিকের ঝাড়-লণ্ঠন। সব হলঘর আর শোবার ঘরে গালচে বিছানো। টেবিলগুলোর উপর থরে থরে রয়েছে দামী-দামী খাবার- দেখলে মনে হয় তাদের ভারে বুঝি টেবিলগুলো ভেঙে পড়বে। আর প্রাসাদের পিছনে রয়েছে প্রকাণ্ড একটা উঠোন। সেই উঠোনের মধ্যে অনেক আস্তাবল আর ঘোড়া আর গোরু আর নানা চমৎকার গাড়ি। আর রয়েছে সুন্দর একটা বাগান। সেখানে ফুটে রয়েছে আশ্চর্য-আশ্চর্য ফুল আর খুব ভালো-ভালো ফল। আর রয়েছে দু মাইলেরও বেশি লম্বা একটা পার্ক। সেখানে রয়েছে নানা জাতের হরিণ আর হরিণী আর খরগোশ—আর মানুষ যা চাইতে পারে তার সব-কিছু।

জেলের বউ বলল, "কেমন—চমৎকার নয় ?"

জেলে বলল, "নিশ্চয়ই। এই সুন্দর প্রাসাদে আমরা সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকব।"

তার বউ বলল, "সেটা দেখা যাবে। এখন চল ঘুমুতে যাওয়া যাক।" তারা দুজনেই গেল ঘুমতে।

পরদিন সকালে প্রথমে ঘুম ভাঙল জেলের বউয়ের। আকাশে সবে তখন দিনের আলো ফুটেছে। বিছানা থেকে সে দেখতে পেল তার দেশের আকাশ-ছোঁয়া সুন্দর মাঠ-ঘাট, অরণ্য-পাহাড়। খানিক পরে তার স্বামীরও ঘুম ভাঙল। কনুই দিয়ে তার পাঁজরে খোঁচা দিয়ে জেলের বউ বলল, "ওগো। উঠে পড়ে আমার সঙ্গে জানলার কাছে এসো। এই-সব মাঠ-ঘাট বন-পাহড়ের কর্ত্রী হতে আমি চাই। পোনামাছটাকে গিয়ে বল আমরা চাই রাজা-রানী হতে।"

জেলে বলল, "বউ! আমাদের রাজা-রানী হবার কী দরকার? রাজা হতে আমি চাই না।"

তার বউ বলল, "তুমি রাজা হতে না চাইলে হয়ো না। আমি চাই রানী হতে। পোনামাছটাকে গিয়ে বল আমাকে রানী হতেই হবে।"

জেলে বলল, বউ! রানী হতে তুমি চাইছ কেন? সে কথা তাকে 'আমি বলতে পারব না।"

খেঁকিয়ে উঠে তার বউ বলল, "বলতে পারবে না কেন শুনি? এক্ষুনি যাও। রানী আমাকে হতেই হবে।"

জেলে চলে গেল। কিন্তু তার বউ রানী হতে চায় জেনে মনে-মনে তার খুব অস্বস্তি। মনে-মনে সে বলল, 'এটা ঠিক নয়, নিশ্চয়ই এটা ঠিক নয়। একবার ভাবল যাবে না। কিন্তু শেষটায় গেল সে।

তীরে যখন পৌঁছল সমুদ্রের জল তখন ঘোলাটে আর কালচে ছাই-ছাই রঙের হয়ে উঠেছে—তলা থেকে যেন উঠেছে গেঁজিয়ে। সেখান থেকে বেরুচ্ছে বিশ্রী একটা পচা গন্ধ। তীরে দাঁড়িয়ে জেলে বলল:

"সমুদ্রের মাছ, আছ তুমি কোথায়,
বউটি যে কান দেয় না আমার কোনো কথায়।"

পোনামাছ প্রশ্ন করল, "কী সে চায়?"

জেলে বলল, "সে চায় রানী হতে।"

পোনামাছ বলল, "বাড়ি ফিরে যাও। গিয়ে দেখবে তার ইচ্ছে পূর্ণ হয়েছে।"

জেলে বাড়ি ফিরল। ফিরে দেখে প্রাসাদটা আরো প্রকাণ্ড হয়ে গেছে। সেটার উপর মস্ত বড়ো একটা গম্বুজ, তাতে চমৎকার ভাস্কর্য। ফটকের সামনে প্রহরী দাঁড়িয়ে। বহু সৈন্য-সামন্ত গিজ্‌গিজ্‌ করছে। বাজছে ব্যাণ্ড আর ঢাক-ঢোল ভেরী-তূরী। প্রাসাদের মধ্যে গিয়ে সে দেখে সব-কিছুই নিখুঁত মর্মর আর সোনা দিয়ে তৈরি। চেয়ার-টেবিলে সোনার ঝুরকো-দেওয়া মখমলের ঢাকা। হল্‌ঘরের দরজাগুলো খুলে যেতে দেখা গেল জমজমাট রাজসভা। সেখানে হীরে-বসানো সোনার উঁচু একটা সিংহাসনে তার বউ বসে। মাথায় তার মস্ত বড়ো সোনার মুকুট। হাতে জহরত-বসানো রাজদণ্ড। সিংহাসনের দু পাশে সারি-সারি দাঁড়িয়ে ছজন রানীর সহচরী। প্রত্যেকে পাশের জনের চেয়ে

এক-মাথা করে ছোটো। তার কাছে গিয়ে জেলে বলল, "বউ! এখন তা হলে রানী হলে?"

সে বলল, "হ্যাঁ, এখন আমি রানী।",

খানিক দাঁড়িয়ে তার দিকে তাকিয়ে জেলে বলল, "তুমি রানী হয়েছ —খুবই সেটা ভালো কথা। আর কিছু আমরা চাইব না।"

"আর কিছু চাইব না মানে?" বলতে-বলতে তার বউ খুবই উত্তেজিত হয়ে উঠল। "এ-সব আর বরদাস্ত করতে পারছি না। ভারি একঘেয়ে লাগছে। পোনামাছটাকে গিয়ে বল আমি মহারানী হতে চাই।"

জেলে বলল, "বউ! মহারানী হতে চাইছ কেন?"

সে বলল, "তুমি পোনামাছটার কাছে যাও তো! আমি মহারানী হব।"

জেলে বলল, "বউ! পোনামাছ তোমাকে মহারানী করতে পারবে না। তাকে সে কথা বলতেও আমার ইচ্ছে করছে না। এ-রাজত্বে মাত্র একজনই মহারানী আছেন। পোনামাছ কিছুতেই তোমাকে মহারাণী করতে পারবে না।"

মুখ ঝামটা দিয়ে জেলের বউ চেঁচিয়ে উঠল, "কী বললে! আমি এখন রানী—তুমি তো নগণ্য আমার স্বামী। এক্ষুনি যাবে কি না বল? এই মুহূর্তে যাও। আমায় সে রানী করতে পারলে মহারানীও করতে পারবে। মহারানী আমাকে হতেই হবে। এক্ষুনি যাও।"

জেলে কী আর করে। যেতে সে বাধ্য হল। কিন্তু যেতে-যেতে বেজায় ভয় পেয়ে সে ভাবতে লাগল, 'এর পরিণাম ভালো হতেই পারে না। মহারানী হতে চাওয়া! এটা তো দারুণ ধৃষ্টতার আবদার! পোনামাছের ধৈর্যের বাঁধ এবার নিশ্চয়ই ভেঙে যাবে।'

এই-সব ভাবতে-ভাবতে সে পৌঁছল সমুদ্রের তীরে। সমুদ্র তখন কুচকুচে কালো হয়ে উঠেছে। যেন তলা থেকে শুরু করেছে ফুটতে। বড়ো-বড়ো বুদ্বুদ ভেসে উঠে ফেটে হয়ে যাচ্ছে চৌচির। ঝোড়ো বাতাসে উঠছে বড়ো-বড়ো ঢেউ। দেখে শুনে জেলে খুব ভয় পেয়ে গেল। তবু তীরে দাঁড়িয়ে সে বলল:

"সমুদ্রের মাছ, আছ তুমি কোথায়,
বউটি যে কান দেয় না আমার কোনো কথায়।"

পোনামাছ প্রশ্ন করল, "কী সে চায় ?"

জেলে উত্তর দিল, "হায় রে। আমার বউ হতে চায় মহারানী।"

পোনামাছ বলল, "বাড়ি ফিরে যাও। গিয়ে দেখবে সে মহারানী হয়ে গেছে।"

তাই শুনে জেলে ফিরে গেল। বাড়ি ফিরে দেখে গোটা প্রাসাদটা হয়ে গেছে ঝকঝকে শ্বেতপাথরের। তাতে বসানো স্ফটিকের নানা মূর্তি আর সোনার কারুকাজ। ঢাক-ঢোল তুরী-ভেরী ঝাঁপ-করতাল বাজছে আর সেই বাজনার তালে-তালে ফটকের সামনে মার্চ করে চলেছে সৈন্যদল। প্রাসাদের মধ্যে চাকর-বাকরের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে নানা ব্যারন আর কাউণ্ট। জেলের জন্য সোনার দরজাগুলো তারা খুলে দিল। ভিতরে গিয়ে জেলে দেখে হাজার-হাজার ফুট উঁচু সোনার একটা সিংহাসনে তার বউ বসে। মাথায় তার হীরে-পান্না-জহরত-বসানো তিন গজ উঁচু বিরাট একটা সোনার মুকুট। এক হাতে তার রাজদণ্ড, অন্য হাতে রাজদণ্ডের মাথা। তার দুপাশে দুসারিতে তার প্রহরীর দল দাঁড়িয়ে। তাদের মধ্যে সব চেয়ে যে লম্বা তার চেহারা বহু ফুট দীর্ঘ দৈত্যের মতো আর সব চেয়ে যে ছোটো তার চেহারা কড়ে আঙুলের মতো। মহারানীর সামনে দাঁড়িয়ে বহু রাজপুত্তুর আর ছোটো-ছোটো রাজ্যের রাজা।

তাদের মধ্যে গিয়ে দাঁড়িয়ে জেলে বলল, "বউ! তুমি তা হলে এখন মহারানী ?"

সে বলল, "হ্যাঁ, আমি মহারানী।"

তাকে খুঁটিয়ে ভালো করে দেখে জেলে বলল, "বউ। তুমি মহারানী হয়েছ—এর চেয়ে ভালো আর কিছু হতে পারে না।"

তার বউ বলল, "এখানে হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছ কেন ? আমি এখন মহারানী, কিন্তু সেই সঙ্গে আমি পোপ্[1] হতেও চাই। গিয়ে পোনামাছটাকে সে কথা বল।"

জেলে বলল, "বউ তুমি চাইছ কী ? তুমি কিছুতেই পোপ্ হতে পার না। খৃস্টীয় জগতে কেবল একজনমাত্রই পোপ্ আছেন। পোনামাছ তোমাকে পোপ্ করতে পারবে না।"

[1] রোমান ক্যাথলিক ধর্মসম্প্রদায়ের প্রধান গুরু।

জেলের বউ বলল, "পোপ্ আমি হবই। শিগ্গির যাও, কারণ আজকের মধ্যেই আমাকে পোপ্ হতে হবে।"

জেলে বলল, "না বউ। ও কথা তাকে বলতে চাই না—বলা উচিত হবে না—এটা খুব বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। পোনামাছ তোমায় পোপ্ করতে পারবে না।"

জেলের বউ বলল, "বাজে বকবক করো না। আমাকে সে মহারানী করতে পারলে পোপ্ করতেও পারবে। এক্ষুনি যাও। আমি মহারানী, আর তুমি তো সামান্য আমার স্বামী। এক্ষুনি যাবে কি না বল।"

তার কথা শুনে ভয় পেয়ে জেলে চলে গেল। কিন্তু মাথা তার ঘুরে উঠল, কাঁপতে লাগল সর্বাঙ্গ, হাঁটুদুটো লাগল ধকধক করতে। তার পর বাতাস শুরু করল আর্তনাদ করতে, উপর দিয়ে উড়তে শুরু করল ঝোড়ো মেঘ আর দেখতে দেখতে পশ্চিম দিগন্ত হয়ে গেল অন্ধকার। গাছের পাতাগুলো উঠল খস্খস্ করে। সমুদ্রের জল যেন ফুটে উঠে হিস্হিস্ করে তার জুতোর উপর লাগল আছড়ে পড়তে। আর দূর থেকে সে দেখল ঢেউয়ের উপর টলমল করতে-করতে জাহাজগুলোকে বিপদসূচক তোপ দাগতে। কিন্তু তখনো আকাশের মাঝখানটা ছিল সামান্য নীল, যদিও সেটার চার পাশ হয়ে উঠেছিল ভয়ংকর তামাটে রঙের—যেন মারাত্মক একটা ঝড় ছুটে আসছে। ভয়ে-ভয়ে সমুদ্রতীরে গিয়ে কাঁপতে কাঁপতে জেলে বলল :

"সমুদ্রের মাছ, আছ তুমি কোথায়,
বউটি যে কান দেয় না আমার কোনো কথায়।"

পোনামাছ প্রশ্ন করল, "কী সে চায় ?"

জেলে উত্তর দিল, "হায় রে। সে চায় পোপ্ হতে।"

পোনামাছ বলল, "বাড়ি ফিরে যাও। গিয়ে দেখবে সে পোপ্ হয়ে গেছে।"

তাই শুনে জেলে ফিরে গেল। বাড়ি ফিরে দেখে সেটা হয়ে গেছে

প্রকাণ্ড একটা গির্জে আর তার চার পাশে রয়েছে নানা প্রাসাদ। ভীড় করে লোকে চলেছে ভিতরে। আর ভিতরে জ্বলছে হাজার-হাজার মোমবাতি। আর তার বউ বসে আছে আগের চেয়েও উঁচু একটা সিংহাসনে। সর্বাঙ্গে তার সোনার গয়না আর মাথায় সোনার তিনটে মুকুট। গির্জের নানা হোমরা-চোমরা লোক তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে। দু পাশে তার সারি সারি নানা বাতি। সবচেয়ে বড়ো বাতিটা সব চেয়ে উঁচু গম্বুজের মতো দীর্ঘ আর মোটা আর সব চেয়ে ছোট্টোটি নেহাতই ক্ষুদে—একেবারে টিমটিম করছে। আর তার সামনে নতজানু হয়ে বসে রাজা আর মহারাজায় চুমু খাচ্ছে তার চটিতে।

তার দিকে তাকিয়ে জেলে বলল, "বউ। তুমি তা হলে এখন পোপ্?"

সে বলল, "হ্যাঁ, আমি এখন পোপ্।"

জেলে তার বউয়ের দিকে ভালো করে তাকাল। তার সর্বাঙ্গ দিয়ে জ্যোতি বেরুচ্ছিল। জেলের মনে হল সে যেন উজ্জ্বল সূর্যের দিকে তাকিয়েছে। তার দিকে খানিক তাকিয়ে থাকার পর জেলে বলল:
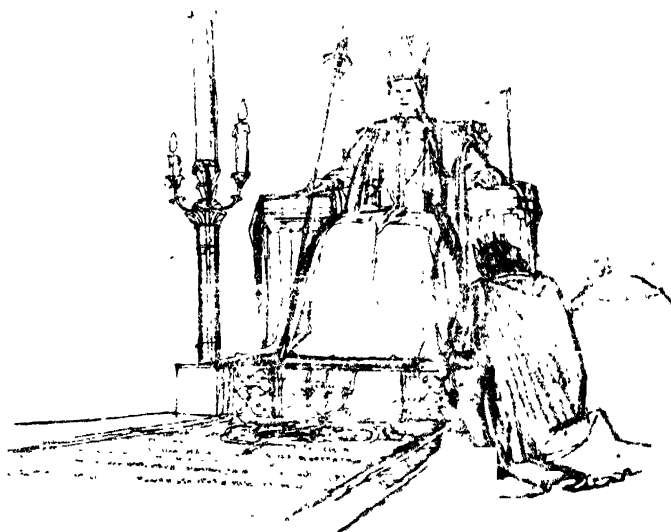
"বউ! তুমি পোপ্ হয়েছ—এর চেয়ে ভালো আর কিছু হতে পারে না।" কিন্তু তার বউ একেবারে কাঠ হয়ে বসে রইল। একটু নড়ল-চড়ল না।

জেলে তখন বলল, "বউ! তুমি এখন পোপ্ হয়েছ—এবার তৃপ্ত হও। কারণ এর চেয়ে বড়ো আর কিছু তুমি হতে পারবে না।"

তার বউ বলল, "সেটা আমি ভেবে দেখব।" তার পর তারা গেল শুতে। কিন্তু জেলের বউ তখনো পরিতৃপ্ত হয় নি। উচ্চাকাংক্ষায় তার ঘুম এল না। ক্রমাগত সে ভাবতে লাগল—আরো বড়ো কী করে হওয়া যায়।

জেলে খুব ভালো করে ঘুমাল। কারণ আগের দিন তাকে অনেক দৌড়ঝাঁপ করতে হয়েছিল। কিন্তু তার বউয়ের দু চোখে ঘুমের ছিটেফোঁটাও নেই। সারারাত কেবল এপাশ-ওপাশ করে আর ভাবতে থাকে—আর কী হওয়া যায়। কিন্তু ভেবে-ভেবে কোনো কুল-কিনারা সে পেল না। যথা সময়ে সূর্য উঠতে শুরু করল। পূর্ব দিকের আকাশ গোলাপী হয়ে উঠতে দেখে বিছানায় বসে আলোর দিকে তাকাল সে। আর জানলার মধ্যে দিয়ে সূর্য উঠতে দেখে সে ভাবল, 'সূর্য আর চাঁদকে ওঠবার আদেশ দিতে আমি কি পারি না?'

কনুই দিয়ে জেলের পাঁজরে খোঁচা দিয়ে সে বলল, "ওগো শুনছ! উঠে পড়ে পোনামাছটাকে গিয়ে বল আমি চাই চাঁদ আর সূর্যকে শাসন করতে।"

জেলের তখনো ভালো করে ঘুম ভাঙে নি। দারুণ ভয়ে আতংকে উঠে বিছানা থেকে সে পড়ে গেল। মনে হল বউয়ের কথা সে ঠিক-মতো বুঝতে পারে নি। তাই চোখ রগড়ে সে বলল, "বউ! কী বল্‌লে?"

তার বউ বলল, "চাঁদ আর সূর্যকে ওঠবার আদেশ না দিতে পারলে, তাকিয়ে থেকে তাদের উঠতে দেখতে হলে—আমি বরদাস্ত করতে পারব না। যখন খুশি তখন তাদের ওঠাতে না পারলে এক দণ্ডও স্বস্তি পাব না।"

এমন কট্‌মট্ করে তার দিকে সে তাকাল যে জেলের সর্বাঙ্গ উঠল শিউরে।

জেলের বউ চেঁচিয়ে উঠল, "এক্ষুনি যাও। চাঁদ আর সূর্যের প্রভু আমি হতে চাই।"

"কী সর্বনাশ, বউ!" বলে জেলে মেঝেয় পড়ে তার সামনে নতজানু হয়ে বসল। "পোনামাছ ওটা করতে পারে না: সে তোমাকে করতে পারে মহারানী আর পোপ্। দোহাই তোমার, পোপ্ হয়েই সন্তুষ্ট থাকো।"

তাই-না শুনে জেলের বউ একেবারে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল। এলোমেলো হয়ে গেল তার মাথার চুল। নিজের জামা-কাপড় ছিঁড়তে ছিঁড়তে গলা ফাটিয়ে চীৎকার করতে-করতে জেলেকে সজোরে লাথি মেরে বলল, "আমি আর বরদাস্ত করতে পারছি না, আমি আর বরদাস্ত করতে পারছি না। যাবে কি না বল!"

তাই চট্‌পট্ পোশাক পরে জেলে ছুটল পাগলের মতো।

বাইরে তখন ভয়ংকর ঝড় হুংকার ছেড়ে চলেছে। জেলের পক্ষে খাড়া থাকাও কঠিন হয়ে উঠল। ঘরবাড়ি গাছপালা পড়ল মাটিতে আছড়ে, কাঁপতে লাগল পাহাড়-পর্বত। পাথরের বড়ো-বড়ো চাঁই লাগল গড়িয়ে গড়িয়ে সমুদ্রে পড়তে। আকাশ হয়ে গেল কুচকুচে কালো। বিদ্যুৎ লাগল চমকাতে, বাজ লাগল পড়তে। মাথায় সাদা ফেনা আর পাহাড়ের মতো উঁচু-উঁচু ঢেউ তুলে ফুঁপিয়ে উঠল সমুদ্র। জেলে তখন চেঁচিয়ে উঠল, যদিও ঝড়-জল বজ্র-বিদ্যুতের মধ্যে নিজের স্বর সে শুনতে পেল না:

"সমুদ্রের মাছ, আছ তুমি কোথায়,
বউটি যে কান দেয় না আমার কোনো কথায়।"

পোনামাছ প্রশ্ন করল, "কী সে চায়?"

জেলে উত্তর দিল, "আমার বউ চায় চাঁদ আর সূর্যের প্রভু হতে।"

পোনামাছ বলল, "বাড়ি ফিরে যাও। গিয়ে দেখবে সে তার পুরনো গোয়ালে ফিরে এসেছে।"

আর আজ পর্যন্ত সেই গোয়ালেই তারা আছে।
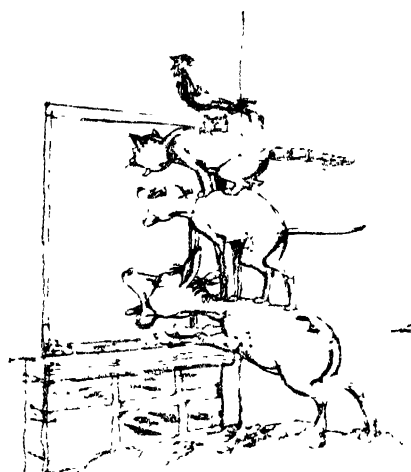
ব্রেমেন্ শহরের গায়ক দল

একটি লোকের একটা গাধা ছিল। অনেক বছর ধরে একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে জাঁতাকলে সে বয়ে নিয়ে গিয়েছিল ভারী-ভারী বস্তা। কিন্তু বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার শক্তি এল কমে। তাই প্রভু স্থির করল তাকে মেরে ফেলবে। কিন্তু গাধাটা টের পেল তার বিপদ ঘনিয়ে এসেছে। তাই সে সেখান থেকে পালিয়ে ধরল ব্রেমেন্ শহরের পথ। কারণ ভাবল সেখানকার গাইয়ে-বাজিয়েদের দলে হয়তো তার জায়গা হবে।

খানিক যাবার পর সে দেখে পথে একটা কুকুর শুয়ে-শুয়ে ঘেউ-ঘেউ করছে! দেখে মনে হয় অনেক পথ ছুটে আসায় সে বেজায় ক্লান্ত। গাধা প্রশ্ন করল, "ওরকম ঘেউ-ঘেউ করছিস কেন?"

কুকুর বলল, "আমি বুড়ো হয়ে গেছি! দিনকের দিন দুর্বল হয়ে পড়ছি। শিকারে আর যেতে পারি না। প্রভু চেয়েছিল আমাকে মেরে ফেলতে। তাই পালিয়ে এসেছি। কিন্তু নিজের রুজি-রোজগার করি কেমন করে?"

গাধা বলল, "কী করতে হবে বলি শোন। আমি চলেছি ব্রেমেন্

শহরে, সেখানকার গাইয়ে-বাজিয়েদের দলে যোগ দিতে। আমার সঙ্গে আয়। আমি বাজাব বীণা, তুই পেটাবি ঢাক।"

কুকুরের তাতে আপত্তি ছিল না। একসঙ্গে তারা যেতে শুরু করল। খানিক যাবার পর তারা দেখে পথের এক পাশে একটা বেড়াল বসে। বর্ষার দিনের মতো মুখটা তার বিষণ্ণ। গাধা প্রশ্ন করল, "তোর কী হয়েছে রে, বুড়ো গুঁফো?"

বেড়াল বলল, "মাথার ওপর খাঁড়া ঝুললে কার মন ভালো থাকে? আমার বয়েস হয়েছে। আগের মতো আর দাঁতে ধার নেই। ইঁদুরের পেছনে ধাওয়া করার চেয়ে উনুনের পেছনে বসে ফ্যাঁস্‌ফ্যাঁস করতেই আমার ভালো লাগে। তাই গিন্নি চান জলে ডুবিয়ে আমাকে মারতে। কোনোরকমে তো পালিয়ে এসেছি। এখন সমস্যা : কোথায় যাই?"

"আমাদের সঙ্গে ব্রেমেন্ শহরে চল। ঐকতান কাকে বলে সেটা তো তোর জানা। সেখানকার গাইয়ে-বাজিয়েদের দলে হয়তো যোগ দিতে পারবি।"

বেড়ালের মনে হল পরামর্শটা ভালো। তাই তাদের সঙ্গে সে চলল। খানিক পরে তারা পৌঁছল এক গোলাবাড়ির উঠোনের কাছে। সেখানকার সামনের ফটকে বসে একটা মোরগ পরিত্রাহি চেঁচাচ্ছিল। গাধা বলল, "তোর চেঁচানি শুনলে তো যে-কোনো লোকের কানের পর্দা ফেটে যাবে। হয়েছেটা কী?"

"বাড়ির গিন্নির শরীরে দয়া-মায়া বলে কোনো জিনিস নেই। কাল রোববারের ডিনারে নানা অতিথি আসবে। রাঁধুনিকে বলেছে আমাকে দিয়ে স্যুপ্ বানাতে। আজ সন্ধ্যায় আমার ঘাড় মটকানো হবে। তাই যতক্ষণ দম আছে চেঁচিয়ে চলেছি।"

গাধা বলল, "কী করতে হবে বলি শোন, লাল-ঝুঁটিদার। আমাদের সঙ্গে ব্রেমেন্ শহরে চল। সেখানে মরার চেয়ে ভালো নিশ্চয়ই একটা কিছু খুঁজে পাবি। তোর গলার স্বরটা ভালো। আমরা সবাই মিলে একটা কন্‌সার্ট দিলে নিশ্চয়ই খুব ভালো হবে।" পরামর্শটা মোরগের পছন্দ হল তাই তারা চারজন একসঙ্গে আবার যাত্রা করল।

একদিনে তারা ব্রেমেন্ শহরে পৌঁছতে পারল না। সন্ধেয় তারা পৌঁছল এক বনে। স্থির করল সেখানে তারা রাতটা কাটাবে। একটা প্রকাণ্ড গাছের তলায় শুলো গাধা আর কুকুর। বেড়াল আর মোরগ

উঠল ডালে। নিজের পক্ষে সব চেয়ে নিরাপদ বলে মোরগ উড়ে গিয়ে বসল মগডালে। ঘুমবার আগে চার দিকে তাকিয়ে তার মনে হল খানিক দূরে যেন একটা আলো মিট্‌মিট্‌ করছে। তাই সঙ্গীদের সে হেঁকে বলল, কাছাকাছি একটা বাড়ি আছে, কারণ একটা আলো তার নজরে পড়েছে। গাধা বলল, "এখানকার পাট চুকিয়ে সেখানেই তা হলে যাওয়া যাক। কারণ এখানকার থাকার বন্দোবস্ত খুব খারাপ।" কুকুর রাজি হয়ে বলল, সামান্য মাংস-লাগানো হাড়-টাড় পেলে মন্দ লাগবে না।

তাই যেদিকে আলো জ্বলছিল সেদিকে তারা যেতে শুরু করল আর খানিক যেতেই দেখল সেই টিম্‌টিমে আলো জ্বল্‌জ্বল্‌ করছে। আলোটা ক্রমশই হয়ে উঠতে লাগল বড়ো আর তার পর তারা পৌঁছল একটা বাড়ির সামনে। বাড়িটা এক ডাকাত দলের। সেটার ভিতরে জ্বলছিল নানা জোরাল বাতি। দলের মধ্যে সব চেয়ে লম্বা গাধা। তাই জানলার কাছে গিয়ে উঁকি মেরে ভিতরে সে তাকাল।

মোরগ প্রশ্ন করল, "কী দেখছ?"

চেঁচিয়ে গাধা বলল, "কী দেখছি? দেখছি একটা টেবিল জুড়ে রয়েছে ভালো-ভালো মাংস আর পানীয়। আর কতকগুলো ডাকাত সেটা ঘিরে বসে মনের আনন্দে ভুরিভোজ করছে।"

মোরগ বলল, "আমাদেরও ঠিক ওরকমটি দরকার।"

গাধা বলল, "নিশ্চয়ই! কিন্তু আমরা ভেতরে যাই কী করে?"

ডাকাতদের কী করে তাড়ানো যায় এই নিয়ে তাদের একটা পরামর্শ সভা বসল। শেষটায় তাদের মাথায় একটা ফন্দি এল। প্রথমে জানলার চৌকাঠের নীচের অংশে সামনেকার পা দুটো তুলে দাঁড়াল গাধা। তার পর কুকুর লাফিয়ে উঠল তার পিঠে, বেড়াল চড়ল কুকুরের কাঁধে আর সবশেষে উড়ে গিয়ে মোরগ বসল বেড়ালের মাথায়। তার পর সমস্বরে গলা ছেড়ে ধরল তারা গান। গাধা চেঁচাতে লাগল হ্যাঁ-কো হ্যাঁ-কো করে, কুকুর করতে লাগল ঘেউ-ঘেউ, বেড়াল মিউ-মিউ আর মোরগ কোঁকোর-কো। আর তার পর তারা জানলা দিয়ে ছুটে ঢুকল ঘরে। ফলে ঝন্‌ঝন্‌ করে ভেঙে গেল জানলার শার্সির কাচ। একসঙ্গে সেই বীভৎস শব্দ শুনে ডাকাতের দল ভাবল বুঝি তাদের মধ্যে একটা ভূত তেড়ে আসছে। তাই দারুণ ভয় পেয়ে লাফিয়ে উঠে দৌড় দিল তারা বনের মধ্যে। আর তার পর সেই চার গায়ক টেবিলটা ঘিরে

বসে এমন খাওয়া খেল যে, মনে হয় একমাস বুঝি তাদের উপোস করে কাটাতে হবে।

ভুরিভোজ শেষ হলে পর সেই চার গায়ক আলো নিভিয়ে যে যার পছন্দমতো জায়গায় গিয়ে শুয়ে পড়ল। গাধা গিয়ে শুলো গোবর গাদায়; দরজার পিছনে গোল হয়ে শুলো কুকুর; বেড়াল শুলো ঘরের উনুনের গরম ছাইয়ের মধ্যে; আর মোরগ গিয়ে বসল ছাদের একটা বরগায়। দীর্ঘ পথ আসার দরুন ক্লান্ত হয়ে তারা সবাই পড়ল ঘুমিয়ে। মাঝ রাত পার হবার পর দূর থেকে ডাকাতের দল দেখল বাড়িটায় আলো জ্বলছে না। তাদের মনে হল সব-কিছুই শান্ত। তখন তাদের সর্দার বলল, "অত তাড়াতাড়ি ভয় পাওয়া আমাদের উচিত হয় নি।" এই-না বলে দলের একজনকে সে পাঠাল বাড়িটা দেখে আসতে। সেই ডাকাত গিয়ে দেখে সব-কিছু চুপচাপ। রান্নাঘরে এসে সে গেল একটা মোমবাতি জ্বালাতে। বেড়ালের জ্বলন্ত চোখদুটোকে জ্বলন্ত কয়লা বলে ভুল করে সেখানে একটা কাঠি বসিয়ে সে ভাবল আগুন জ্বলে উঠবে। বেড়াল কিন্তু এই রসিকতার মানে বুঝতে পারল না। তাই তার মুখের উপর ঝাঁপ দিয়ে আঁচড়ে আর থুথু ছিটিয়ে তাকে নাস্তানাবুদ করে ছাড়ল। দারুণ ঘাবড়ে সে চেষ্টা করল দৌড়ে খিড়কি-দরজা দিয়ে পালাতে। সেখানে শুয়ে ছিল কুকুর। লাফিয়ে উঠে সে তার পা দিল কামড়ে। গোলাবাড়ির উঠোনের মধ্যে দিয়ে সে দিল দৌড়। কিন্তু গোবর গাদার পাশ দিয়ে যাবার সময় গাধা তার পিছনের পা দিয়ে কষালো সাংঘাতিক লাথি। আর এই-সব হৈচৈ শুনে জেগে উঠে মোরগ তার বরগায় বসে তারস্বরে ডাক জুড়ে দিল; কোঁ-কো-র-কো-কো কোঁ-কো-র-কো-কো।

পড়িমরি করে ছুটে সেই ডাকাত তার সর্দারের কাছে ফিরে হাউমাউ করে বলল, "কী সর্বনাশ! আমাদের বাড়িতে ভয়ংকর একটা ডাইনি বসে আছে। আমাকে দেখে ফ্যাঁস্ ফ্যাঁস্ করে উঠে তার লম্বা লম্বা নখ দিয়ে আমার মুখ আঁচড়ে শেষ করে দিয়েছে। দরজার সামনে ছোরা হাতে বসে আছে একটা লোক। আমার পায়ে সে ছোরা বসিয়েছে। উঠোনে শুয়ে আছে প্রকাণ্ড একটা কালো দৈত্য। মুগুর দিয়ে আমায় সে পিটেছে। আর ছাতের বরগায় বসে আছেন জজ্-সায়েব। ক্রমাগত তিনি চেঁচাচ্ছেন: 'পাজি বদমায়েশটাকে আমার কাছে ধরে আন।' তাই কোনোরকমে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসেছি।"

সেদিন থেকে ডাকাতের দল বাড়িটায় ফিরে যেতে আর সাহস করে নি। কিন্তু ব্রেমেন্ শহরের সেই চারজন গায়কের কাছে বাড়িটা এমন আরামের বলে মনে হয়েছিল যে, সেখান থেকে আর তারা বেরোয় নি।

চালাক হান্‌স্‌

হান্‌স্‌-এর মা প্রশ্ন করলেন, "হান্‌স্‌ যাচ্ছিস কোথায় ?"

হান্‌স্‌ বলল, "গ্রেথেলের বাড়ি।"

"তার সঙ্গে আবার ভাবসাব করতে ?"

"আবার ভাবসাব তো কবেই হয়ে গেছে, মা। চললাম।"

"আয় বাছা।"

গ্রেথেলের বাড়িতে পৌঁছল হান্‌স্‌। "শুভদিন, গ্রেথেল।"

"শুভদিন হান্‌স্‌। আমার জন্যে ভালো কিছু এনেছিস ?"

"কিছুই আনি নি রে। বরঞ্চ তুই কিছু আমায় দে।"

হান্‌স্‌কে গ্রেথেল দিল একটা ছুঁচ। হান্‌স্‌ বলল, "চলি, গ্রেথেল।"

গ্রেথেল বলল, "আয়, হান্‌স্‌।"

খড়ের গাড়িতে ছুঁচটা আটকে সেটার পিছন পিছন হেঁটে হান্‌স্‌ বাড়ি ফিরল। "শুভসন্ধ্যা, মা।"

"শুভসন্ধ্যা, হান্‌স্‌। কোথায় গিয়েছিলি ?"

"গ্রেথেলের বাড়ি।"

"তার জন্য কি নিয়ে গিয়েছিলি ?"

"কিছুই না। সে আমাকে একটা জিনিস দিয়েছে।"

"কি দিয়েছে রে ?"

"একটা ছুঁচ।"

"কোথায় সেটা, হান্‌স্‌ ?"

"খড়ের গাড়িতে সেটা আটকে দিয়েছি।"

"বোকার মতো কাজ করেছিস, হান্‌স্‌। ছুঁচটা তোর জামার আস্তিনে আটকানো উচিত ছিল।"

"তাতে কিছু যায় আসে না। পরের বার কথাটা মনে রাখব।"

"চললি কোথায়, হান্‌স্‌?"

"গ্রেথেলের বাড়ি, মা।"

"ঝগড়া মিটিয়ে ফেলিস, হান্‌স্‌।"

"নিশ্চয়ই। চলি—মা।"

"আয় বাছা।"

গ্রেথেলের বাড়িতে হান্‌স্‌ পৌঁছল। "শুভদিন, গ্রেথেল।"

"শুভদিন, হান্‌স্‌। আমার জন্যে কি এনেছিস?"

"কিছুই না। আমাকে কিছু দে।"

হান্‌স্‌কে গ্রেথেল একটা ছুরি দিল।

"চলি, গ্রেথেল।"

"আয়, হান্‌স্‌।"

ছুরিটা জামার আস্তিনে আটকে হান্‌স্‌ বাড়ি ফিরল। "শুভ-সন্ধ্যা, মা।"

"শুভসন্ধ্যা, হান্‌স্‌। কোথায় গিয়েছিলি?"

"গ্রেথেলের বাড়ি।"

"তার জন্য কী নিয়ে গিয়েছিলি?"

"কিছুই না। কিন্তু সে আমাকে একটা জিনিস দিয়েছে।"

"কি দিয়েছে রে?"

"একটা ছুরি।"

"কোথায় সেটা?"

"আমার জামার আস্তিনে সেটা আটকে দিয়েছি।"

"বোকার মতো কাজ করেছিস, হান্‌স্‌। সেটা তোর পকেটে রাখা উচিত ছিল।"

"তাতে কিছু যায় আসে না। পরের বার কথাটা মনে রাখব।"

"চললি কোথায়, হান্‌স্‌?"

"গ্রেথেলের বাড়ি, মা।"

"ঝগড়া মিটিয়ে ফেলিস।"

"নিশ্চয়ই!"

"আয় বাছা, হান্‌স্।"

"চলি, মা।"

গ্রেথেলের বাড়িতে হান্‌স্ পৌঁছল। "শুভদিন, গ্রেথেল।"

"শুভদিন, হান্‌স্। আমার জন্যে কী এনেছিস?"

"কিছুই না। আমাকে কিছু দে।"

হান্‌স্‌কে গ্রেথেল একটা ছাগল-ছানা দিল।

"চলি, গ্রেথেল।"

"আয়, হান্‌স্।"

ছাগলছানার পা চারটে একসঙ্গে বেঁধে সেটাকে তার পকেটে রাখল হান্‌স্। যখন সে বাড়ি পৌঁছল ছাগল-ছানাটা তখন দম বন্ধ হয়ে মরেছে। "শুভসন্ধ্যা, মা।"

"শুভসন্ধ্যা, হান্‌স্। কোথায় গিয়েছিলি?"

"গ্রেথেলের বাড়ি।"

"তার জন্যে কী নিয়ে গিয়েছিলে?"

"কিছুই না। সে আমাকে একটা জিনিস দিয়েছে।"

"কি দিয়েছে রে?"

"একটা ছাগল-ছানা।"

"কোথায় সেটা?"

"আমার পকেটে।"

"বোকার মতো কাজ করেছিস, হান্‌স্। ছাগলছানাটার গলায় দড়ি বেঁধে নিয়ে আসা উচিত ছিল!"

"তাতে কিছু আসে-যায় না। পরের বার কথাটা মনে রাখব।"

"চললি কোথায়, হান্‌স্?"

"গ্রেথেলের বাড়ি, মা।"

"ঝগড়া মিটিয়ে ফেলিস।"

"নিশ্চয়ই! চলি, মা।"

"আয় বাছা, হান্‌স্।"

গ্রেথেলের বাড়িতে হান্‌স্‌ পৌঁছল। "শুভদিন, গ্রেথেল।"

"শুভদিন হান্‌স্‌। আমার জন্যে কী এনেছিস ?"

"কিছুই না। আমাকে কিছু দে।"

"গ্রেথেল তাকে নুনে-জরানো এক টুকরো শুয়োরের মাংস দিল।"

"চলি, গ্রেথেল।"

"আয়, হান্‌স্‌।"

নুনে-জরানো শুয়োরের মাংসর টুকরোতে দড়ি বেঁধে টানতে-টানতে নিয়ে চলল হান্‌স্‌। কুকুরের দল ছুটে এসে সেটা ফেলল খেয়ে। যখন সে বাড়ি পৌঁছল তখন তার হাতে শুধুই দড়িটা। দড়িটার অন্যপ্রান্তে কিছু নেই।" "শুভসন্ধ্যা, মা।"

"শুভসন্ধ্যা, হান্‌স্‌। কোথায় গিয়েছিলি ?"

"গ্রেথেলের বাড়ি।"

"তার জন্যে কি নিয়ে গিয়েছিলি ?"

"কিছুই না। কিন্তু সে আমাকে একটা জিনিস দিয়েছে।"

"কী দিয়েছে রে ?"

"নুনে-জরানো এক টুকরো শুয়োরের মাংস।"

"সেটা নিয়ে কি করলি হান্‌স্‌ ?"

"দড়িতে বেঁধে বাড়িতে টেনে আনছিলাম। কুকুরের দল চুরি করে নিয়েছে।"

"বোকার মতো কাজ করেছিস, হান্‌স্‌। সেটা তোর মাথায় করে আনা উচিত ছিল।"

"তাতে কিছু যায় আসে না। পরের বার কথাটা মনে রাখব।"

"চললি কোথায়, হান্‌স্‌ ?"

"গ্রেথেলের বাড়ি, মা।"

"আয় বাছা, হান্‌স্‌।"

"আসি, মা।"

গ্রেথেলের বাড়িতে হান্‌স্‌ পৌঁছল। "শুভদিন, গ্রেথেল।"

"শুভদিন, হান্‌স্‌। আমার জন্যে কী এনেছিস ?"

"কিছুই না। আমাকে কিছু দে।"

গ্রেথেল তাকে একটা বাছুর দিল।

"চলি, গ্রেথেল।"

"আয়, হান্‌স্।"

বাছুরটাকে মাথায় তুলল হান্‌স্। সঙ্গে সঙ্গে সেটা হান্‌স্-এর মুখে চাঁটি ছুঁড়ল। শুভসন্ধ্যা, মা।"

"শুভসন্ধ্যা, হান্‌স্। কোথায় গিয়েছিলি ?"

"গ্রেথেলের বাড়ি।"

"তার জন্যে কী নিয়ে গিয়েছিলি ?"

"কিছুই না। সে কিন্তু আমাকে একটা বাছুর দিয়েছে।"

"কোথায় সেটা ?"

"সেটাকে মাথায় করে আনছিলাম। আমার মুখে সেটা চাঁটি মেরেছে।"

"বোকার মতো কাজ করেছিস, হান্‌স্। বাছুরটাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে এনে গোয়ালে রাখা উচিত ছিল।"

"তাতে কিছু যায় আসে না। পরের বার কথাটা মনে রাখব।"

"কোথায় চললি, হান্‌স্ ?"

"গ্রেথেলের বাড়ি, মা।"

"তাকে বিয়ের কথা বলতে ?"

"আগেই তাকে বলেছি। আসি, মা।"

"আয় বাছা, হান্‌স্।"

গ্রেথেলের বাড়িতে হান্‌স্ পৌঁছল। "শুভদিন, গ্রেথেল।"

"শুভদিন, হান্‌স্। আমার জন্যে কী এনেছিস ?"

"কিছুই না। আমাকে কিছু দে।"

হান্‌স্‌কে গ্রেথেল বলল, "এবার আমাকে নিয়ে চল। তোর সঙ্গে যাব।"

গ্রেথেলের গলায় দড়ি জড়িয়ে এনে হান্‌স্ তাকে বেঁধে রাখল গোয়াল ঘরে।

তার মা বললেন, "শুভসন্ধ্যা, হান্‌স্।"

"শুভসন্ধ্যা, মা।"

"কোথায় গিয়েছিলি ?"

"গ্রেথেলের বাড়ি।"

"তার জন্যে কী নিয়ে গিয়েছিলি ?"

"কিছুই না।"

"গ্রেথেল তোকে কী দিল ?"

"কিছুই না। কিন্তু আমার সঙ্গে এসেছে।"

"কোথায় তাকে রেখে এলি ?"

"তার গলায় দড়ি জড়িয়ে এনে গোয়ালে বেঁধে রেখেছি। খেতে দিয়েছি এক গোছা ঘাস।"

"বোকার মতো কাজ করেছিস, হান্‌স্‌। তার দিকে ভেড়ার চোখে তাকানো উচিত ছিল।"[১]

"তাতে কিছু যায় আসে না মা, পরের বার কথাটা মনে রাখব।"

গোয়াল-ঘরে গিয়ে সেখানকার সব ভেড়া আর বাছুরের চোখ উপড়ে গ্রেথেলের মুখে সেগুলো ফেলল হান্‌স্‌।

তাতে গ্রেথেল ভীষণ রেগে দড়ি খুলে ছুটে পালাল আর তার পর হয়ে গেল হান্‌স্‌-এর বউ।

[১] ইংরিজিতে Sheep's-eye মানে ভালোবাসাপূর্ণ দৃষ্টি।

ছোটো লাল-টুপি

এক সময় ছিল একটি ছোট্টো মেয়ে। তাকে দেখলেই লোকে ভালো-বেসে ফেলত। ঠাকুমা তাকে সব চেয়ে ভালোবাসতেন। তাকে উপহার দিয়ে-দিয়ে তাঁর আশ মিটত না। একবার মেয়েটিকে তিনি দেন লাল মখমলের ছোট্টো একটা টুপি। টুপিটা ভারি মানাতো মেয়েটিকে। তাই সব সময় সেটা সে পরত। ফলে তার নাম হয়ে যায় লাল-টুপি।

একদিন মা তাকে বলল, "লাল-টুপি, এই কেক আর এই এক বোতল আঙুর-রস তোর ঠাকুমাকে দিয়ে আয়। তাঁর শরীর ভালো যাচ্ছে না। এই ভালো জিনিসগুলো খেলে তিনি চাঙ্গা হয়ে উঠবেন। রোদ কড়া হয়ে উঠবার আগেই যাত্রা করিস। সভ্যভব্য হয়ে হাঁটিস। খবরদার দৌড়াবি না। দৌড়লে হোঁচট খেয়ে পড়বি, আর বোতলটা যাবে ভেঙে—তোর ঠাকুমা আঙুর-রস খেতে পাবেন না। আর মনে

রাখিস, তাঁর ঘরে ঢুকে এদিক-সেদিক তাকাবার আগে 'সুপ্রভাত' বলতে যেন ভুল না হয়।"

লাল-টুপি তার মাকে চুমু খেয়ে বলল, "যা-যা বললে সব করব।"

তার ঠাকুমা থাকতেন এক বনে। তাদের গ্রাম থেকে হেঁটে যেতে লাগে আধ ঘণ্টা। বনে পৌঁছে লাল-টুপির সঙ্গে দেখা হয়ে গেল নেকড়ের। জন্তুটা যে কী রকম পাজি আর হিংস্র সে-সম্বন্ধে মেয়েটির কোনো ধারণাই ছিল না। তাই তাকে দেখে মোটেই ভয় পেল না সে।

নেকড়ে বলল, "সুপ্রভাত, লাল-টুপি!"

"ধন্যবাদ, নেকড়ে," উত্তর দিল লাল-টুপি।

"ছোট্টো লাল-টুপি, এত সকাল-সকাল কোথায় চলেছ?"

"ঠাকুমার কাছে।"

"তোমার আলোয়ানের নীচে কী আছে?"

"কেক আর আঙুর-রস। গতকাল ছিল কেক-রুটি সেঁকার দিন। ঠাকুমার শরীর খারাপ। তাই আমরা ভাবলাম এই ভালো-ভালো খাবার পেলে তিনি খুশি হবেন।

"তোমার ঠাকুমা কোথায় থাকেন, লাল-টুপি?"

"এই বনে। আরো মিনিট পনেরোর পথ। তিনটে প্রকাণ্ড ওক-গাছের নীচে তাঁর বাড়ি। পাশেই একটা বাদাম ঝাড়।"

নেকড়ে ভাবল, 'এই নিরীহ বাচ্চা মেয়েটার মাংস বুড়িটার চেয়ে নিশ্চয়ই খেতে অনেক ভালো। আমাকে সাবধানে ফন্দি আঁটতে হবে—দুটোকেই যাতে সাবড়ানো যায়।'

তারা পাশাপাশি খানিক হাঁটার পর নেকড়ে বলল, "লাল-টুপি, তোমার চার পাশে কত সুন্দর-সুন্দর ফুল ফুটে আছে দেখো। তাদের না দেখে সোজা তাকিয়ে চলেছ কেন? লাল-টুপি, আমার মনে হয় পাখিদের মিষ্টি গানও তুমি শুনছ না। এমন গোমড়া মুখে হাঁটছ যেন চলেছ ইস্কুলে। বনের সুন্দর-সুন্দর জিনিসগুলো একেবারে লক্ষ্যই করছ না।"

চোখ তুলে তাকিয়ে লাল-টুপি দেখল গাছের ডালপালার মধ্যে দিয়ে এসে সূর্যের-রশ্মি পড়েছে সুন্দর-সুন্দর ফুলের উপর। সে ভাবল, 'এক তোড়া তাজা সুগন্ধি ফুল নিয়ে গেলে ঠাকুমা নিশ্চয়ই খুব খুশি হবেন। এখনো বেলা বাড়ে নি। হাতে অনেক সময় আছে।' এই-না ভেবে

আসল পথ ছেড়ে সে ছুটল ফুল তুলতে। এক-একটা ফুল তোলে আর দেখে আরো দূরে আরো সুন্দর-সুন্দর ফুল ফুটে রয়েছে। এইভাবে ফুল তুলতে তুলতে সে পৌঁছল বনের গহনে।

ইতিমধ্যে মেয়েটির ঠাকুমার বাড়িতে গিয়ে নেকড়ে দরজায় দিল টোকা।

ঠাকুমা প্রশ্ন করলেন, "কে?"

"আমি লাল-টুপি। আপনার জন্যে কেক আর আঙুর-রস এনেছি। দরজা খুলুন।"

ঠাকুমা চেঁচিয়ে বললেন, "হুড়কোটা তোলো। আমি ভারি দুর্বল। উঠতে পারছি না।"

হুড়কো তুলে, ভিতরে না গিয়ে আর কোনো কথা না বলে ঠাকুমাকে গিলে ফেলল নেকড়ে। তার পর তাঁর পোশাক পরে, তাঁর রাত-টুপি মাথায় দিয়ে, তাঁর বিছানায় শুয়ে খাটের চার পাশের পর্দা টেনে দিল।

রাশি-রাশি ফুল তুলল লাল-টুপি। এত ফুল যে তার পক্ষে সেগুলো বয়ে নিয়ে যাওয়াই শক্ত। তার পর সে ধরল তার ঠাকুমার বাড়ি যাবার পথ। সেখানে পৌঁছে দরজা খোলা দেখে সে অবাক হল। ঘরের মধ্যেকার সব-কিছুই তার মনে হল কেমন যেন অদ্ভুত। ভাবল, 'কী কাণ্ড! আজ আমার গা ছম্‌ছম্‌ করে কেন? আমার তো ঠাকুমার কাছে আসতে খুব ভালো লাগে!'

লাল-টুপি চেঁচিয়ে উঠল, "সুপ্রভাত!" কিন্তু কোনো উত্তর পেল না। তার পর খাটের কাছে গিয়ে পর্দা সরিয়ে দেখে মুখের উপর রাত-টুপিটা টেনে নামিয়ে তার ঠাকুমা শুয়ে। কিন্তু তাঁকে কেমন যেন অদ্ভুত দেখাচ্ছে।

"ঠাকুমা, তোমার কানগুলো কী বড়ো-বড়ো!" চেঁচিয়ে উঠল সে।

"বড়ো বলে অনেক ভালো শুনতে পাই।"

"ঠাকুমা, তোমার চোখগুলো কী বড়ো-বড়ো!"

"বড়ো বলে অনেক ভালো দেখতে পাই।"

"ঠাকুমা, তোমার হাতগুলো কী বড়ো-বড়ো!"

"বড়ো বলেই তো তোকে ভালো করে জড়িয়ে ধরতে পারি।"

"ঠাকুমা, তোমার এরকম সাংঘাতিক বড়ো মুখ তো কখনো দেখি নি।"

"বড়ো বলেই তো ভালো করে তোকে গিলতে পারব।"

কথাটা বলে নেকড়ে বিছানা থেকে মুখ বার করে ছোট্টো লাল-টুপিকে গিলে ফেলল। এইভাবে ক্ষিদে মিটিয়ে আবার বিছানায় শুয়ে নেকড়ে পড়ল ঘুমিয়ে। তার নাক ডাকতে লাগল অসম্ভব জোরে-জোরে।

ঠিক সেই সময় বনকর্মী যাচ্ছিল বাড়িটার পাশ দিয়ে। আপন মনে সে বলে উঠল, "ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে বুড়ি দারুণ গোঙাচ্ছে তো! অসুখ-বিসুখ করল কি না ভেতরে গিয়ে দেখি।" ভিতরে গিয়ে সে দেখে বিছানায় নেকড়েটা শুয়ে। সে চেঁচিয়ে উঠল, "বুড়ো শয়তান, তুই তা হলে এখানে। অনেকদিন ধরে তোর খোঁজ করছি।" এই-না বলে নিজের বন্দুকে গুলি ভরতে সে শুরু করল। হঠাৎ তার মনে হল বুড়িকে হয়তো নেকড়েটা গিলেছে। তাই গুলি না ছুঁড়ে কাঁচি দিয়ে সে কাটতে শুরু করল ঘুমন্ত জন্তুটার পেট।

কাঁচি দিয়ে কচ্‌কচ্ করে দু ধার কাটতেই প্রথমে দেখা গেল ছোট্টো একটা লাল-টুপির ডগা আর তার কয়েক মুহূর্ত পরেই সেই টুপির মালিক এক লাফে বেরিয়ে এসে চেঁচিয়ে উঠল, "উঃ! কী যে ভয় পেয়েছিলাম। একেবারে ঘুটঘুটে অন্ধকার—ধারণাই করতে পারবে না নেকড়ের পেটের ভেতরটা কী ভীষণ অন্ধকার!" আর তার পর বেরিয়ে এলেন বুড়ি ঠাকুমা। তখনো তিনি বেঁচে, কিন্তু নিশ্বেস নিচ্ছিলেন খুব কষ্ট করে।

তাড়াহুড়ো করে লাল-টুপি নিয়ে এল বড়ো-বড়ো পাথর। সেগুলো সে ভরল নেকড়েটার পেটে। ঘুম ভাঙার পর যাবার জন্য নেকড়ে উঠল। কিন্তু পাথরগুলো এমনই ভারী যে, সে সঙ্গে সঙ্গে গেল পড়ে আর তার পর মরে। নেকড়েকে মরতে দেখে তারা তিনজনেই খুব খুশি। নেকড়েটার চামড়া নিয়ে বনকর্মী তার বাড়ি গেল। ঠাকুমা তারিয়ে-তারিয়ে খেলেন সেই কেক আর আঙুর-রস। আর লাল-টুপি মনে-মনে বলল, 'মা যে পথে যেতে বলেছিল সে পথ ছেড়ে বনের মধ্যে অন্য পথে জীবনে আর কখনো যাব না।"

শোনা যায় আর-একবার নতুন-সেঁকা একটা কেক নিয়ে লাল-টুপি আবার যাচ্ছিল তার ঠাকুমার সঙ্গে দেখা করতে। এমন সময় তার সঙ্গে দেখা হয় আর-একটা নেকড়ের। সেটাও চেষ্টা করে আসল পথ

থেকে তাকে সরিয়ে আনতে। কিন্তু লাল-টুপি তখন আগের চেয়ে অনেক সাবধানী হয়ে গিয়েছিল। তাই নেকড়ের কথায় সে কান দিল না। ঠাকুমার বাড়ি পৌঁছে নেকড়েটার কথা তাঁকে সে বলল: জানাল শয়তানের মতো কী রকম আড়চোখে তার দিকে তাকিয়ে সে বলেছিল "সুপ্রভাত।" বলল, আসল পথে না থাকলে সঙ্গে সঙ্গে নেকড়েটা আমায় খেয়ে ফেলত।"

ঠাকুমা বললেন, "আয়, দরজায় আমরা হুড়কো দিয়ে দি। তা হলে ওটা আর ভেতরে আসতে পারবে না।"

খানিক পরেই নেকড়ে দরজায় টোকা দিয়ে বলল, "ঠাকুমা, দরজা খুলুন। আমি লাল-টুপি! আপনার জন্যে চমৎকার নতুন একটা কেক এনেছি।" তারা চুপচাপ রইল। দরজা খুলল না। নেকড়েটা তখন চোরের মতো পা টিপে-টিপে বাড়ির চার দিকে ঘুরতে লাগল। শেষটায় লাফ দিয়ে ছাতে উঠে অপেক্ষা করতে লাগল সন্ধের জন্য—যখন লাল-টুপি আবার বাড়ি ফিরবে আর অন্ধকারে তার পিছন পিছন গিয়ে লাল-টুপিকে সে ফেলবে খেয়ে।

ঠাকুমা কিন্তু নেকড়ের মতলব বুঝতে পেরে নাতনিকে বললেন, "লাল-টুপি, এই বালতিটা নে। গতকাল আমি সসেজ্ সেদ্ধ করেছিলাম। যে জলে সসেজ্ সেদ্ধ করি সেই জল নিয়ে গিয়ে চৌবাচ্চায় ঢাল।" সেই জল বালতি-বালতি নিয়ে গিয়ে লাল-টুপি প্রকাণ্ড চৌবাচ্চাটা ভরে ফেলল। তার পর নেকড়ের নাকে গিয়ে পৌঁছল সসেজের গন্ধ। শুঁকতে-শুঁকতে ছাত থেকে সে নীচে উঁকি মারতে লাগল। গলা বাড়িয়ে ঝুঁকতে ঝুঁকতে সে আর টাল সামলাতে পারল না। ঝপাং করে সেই প্রকাণ্ড চৌবাচ্চায় পড়ে সে ডুবে মরল। খুশি মনে লাল-টুপি ফিরল তার বাড়িতে। পথে কেউ আর তার কোনো ক্ষতি করতে চেষ্টা করল না।

শেয়াল-গিন্নির বিয়ে

এক সময় ছিল এক বুড়ো শেয়াল। নটা তার লেজ। তার কেমন করে যেন মাথায় এল—বউ তাকে ভালোবাসে না। সে স্থির করল বউ তাকে সত্যি-সত্যি ভালোবাসে কি না সেটা পরখ করে দেখবে। তাই সে সোফার নীচে টান-টান হয়ে শুয়ে পড়ল, শরীরের একটা পেশীও নাড়াল না। দেখলে মনে হয় মরে যেন কাঠ হয়ে গেছে। শেয়াল-গিন্নি তার ঘরে গিয়ে দরজায় হুড়কো দিল। বলে গেল তার দাসী মিস্ পুসিকে উনুন-পাশে বসে রান্নাবান্না করতে। খানিক পরেই রটে গেল শেয়াল-কর্তা মরেছে। তাই শেয়াল-গিন্নিকে বিয়ে করার জন্য আসতে লাগল অনেকে। দরজার ঘণ্টা বাজাতে মিস্ পুসি গেল দরজা খুলতে। বিয়ে করার জন্য যে এসেছিল সে তাকে প্রশ্ন করল, "মিসেস্ শেয়াল কী করছেন? কেমন আছেন?" মিস্ পুসি উত্তর দিল:

"গিন্নি-মা ঘরে একা
শোকের নেই লেখা-জোখা।
কেঁদে-কেঁদে লালচে চোখ
স্বামীর জন্যে বড়োই শোক।"

"মিস্, দয়া করে তাঁকে গিয়ে বল, দোর-গোড়ায় এক তরুণ শেয়াল দাঁড়িয়ে—সে তাকে বিয়ে করতে চায়।"

"বলছি, স্যার।" মিস্ পুসি তর্‌তর্ করে সিঁড়ি দিয়ে উঠে টুক্-টুক্ করে শেয়াল-গিন্নির দরজায় টোকা দিল।

"গিন্নি-মা, ভেতরে আছেন ?"

"হ্যাঁ রে পুসি, ভেতরে আছি।"

"দোরগোড়ায় একজন আপনাকে বিয়ে করার জন্যে দাঁড়িয়ে।"

"বাছা, সে কি খুব চালিয়াৎ ? আর আমার মৃত স্বামীর মতো তার কি সুন্দর-সুন্দর ন'টা লেজ আছে ?"

"না, গিন্নি-মা। তাঁর মাত্র একটা লেজ।"

"তা হলে তাকে আমি বিয়ে করব না।"

মিস্ পুসি নীচে গিয়ে শেয়ালটাকে তাড়িয়ে দিল। কিন্তু খানিক বাদেই আবার বাজল দরজার ঘণ্টা। দেখা গেল আর-একটা তরুণ শেয়াল দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে। সেও চায় শেয়াল-গিন্নিকে বিয়ে করতে। কিন্তু তার ছিল দুটো লেজ। তাই প্রথমজনের মতো সেও বাতিল হয়ে গেল। তার পর একে-একে আসতে লাগল আরো অনেকে। যে আসে আগের জনের চেয়ে তার একটা লেজ বেশি। শেষটায় যে এল মৃত শেয়ালের মতো তার ন'টা লেজ।

সে কথা শুনে বিধবা শেয়াল-গিন্নির দারুণ ফুর্তি। সে বলে উঠল, "এক্ষুনি তার জন্যে দরজা খোলো আর বুড়ো শেয়ালের মৃতদেহ দাও বাইরে বার করে।"

বিয়ের সব ঠিকঠাক। দিনক্ষণ স্থির। নিমন্ত্রিতরা হাজির। এমন সময় বুড়ো শেয়াল বেঁচে উঠল আর তার পর শেয়াল-গিন্নি সমেত সব অতিথি-অভ্যাগতদের ঝেঁটিয়ে বিদায় করল বাড়ি থেকে।

দ্বিতীয় গল্প

শেয়াল-কর্তা মারা যাবার পর নেকড়ে এল শেয়াল-গিন্নিকে বিয়ে করতে। দরজায় টোকা দিতে মিস্ পুসি এসে দরজা খুলে দিল।

নেকড়ে বলল, "শুভদিন, ম্যাডাম। এখানে একলা বসে কেন ? ভালো-ভালো কী সব রাঁধছ ?"

মিস্ পুসি বলল :

"দুধ আর সুরা দিয়ে
সব সেরা স্যুপটা,
মশাই আসুন দেখি,
বদলান মুখটা।"

নেকড়ে বলল, "ধন্যবাদ, ম্যাডাম পুসি। কিন্তু শেয়াল-গিন্নি কি বাড়ি নেই?"

মিস্ পুসি বলল, "গিন্নি-মা ঘরে একলা রয়েছেন। শেয়াল-কত্তা মারা গেছেন বলে কেঁদে-কেঁদে আকুল।"

নেকড়ে বলল, "আর-একটা বর চাইলে তাঁকে বল গে নীচে নামতে।"

তর্ তর্ করে সিঁড়ি দিয়ে উঠে সোনার আংটি-পরা পাঁচটা আঙুল দিয়ে শেয়াল-গিন্নির শোবার ঘরের দরজায় টোকা দিয়ে মিস্ পুসি চেঁচিয়ে উঠল, "গিন্নি-মা, গিন্নি-মা! বর চাও তো নীচে এসো।"

বিধবা শেয়াল-গিন্নি বলল, "ভদ্দরলোকের পায়ে কি ছোট্টো লাল মোজা, আর মুখটা ছুঁচল?"

মিস্ পুসি বলল, "না।"

শেয়াল-গিন্নি বলল, "তা হলে ওকে দিয়ে কোনো কাজ হবে না।"

নেকড়েকে পছন্দ না হতে বর হবার জন্য একে-একে এল পৃথিবীর সব জন্তু-জানোয়ার—কুকুর, হরিণ, খরগোশ, ভালুক, সিংহ। কিন্তু শেয়াল-কর্তার ভালো গুণগুলো তাদের ছিল না। তাই প্রত্যেককেই বাতিল করে দেওয়া হল। সবশেষে এল এক তরুণ শেয়াল। বিধবা শেয়াল-গিন্নি যথারীতি প্রশ্ন করল, "ভদ্দরলোকের পায়ে কি ছোট্টো লাল মোজা, আর মুখটা ছুঁচল?"

মিস্ পুসি বলল, "হ্যাঁ।"

শেয়াল-গিন্নি বলল, "তা হলে তাকে আসতে দাও।" আর সঙ্গে সঙ্গে দাসীকে আদেশ দিল বিয়ের ব্যবস্থা করতে।

মানুষ আর নেকড়ে

এক সময় এক শেয়াল এক নেকড়েকে বলছিল মানুষের ক্ষমতার কথা। বলছিল নানা ধরণের ছলাকলার সাহায্য না নিলে কোনো জন্তুই তার সঙ্গে এঁটে উঠতে পারবে না।

শুনে নেকড়ে বলল, "মানুষের যদি দেখা পাই তা হলে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ব।"

শেয়াল বলল, "তোমাকে আমি সাহায্য করতে পারি। কাল সকালে আমার কাছে এসো। তোমাকে একটা মানুষ দেখিয়ে দেবো।"

পরদিন ভোর-ভোর উঠে নেকড়ে গেল শেয়ালের কাছে। যে-পথ দিয়ে বনকর্মী আসে সেই পথে শেয়াল তাকে নিয়ে গেল। প্রথমে তাদের সঙ্গে দেখা এক বুড়ো সৈনিকের।

নেকড়ে প্রশ্ন করল, "ওটা কি মানুষ?"

শেয়াল বলল, "না। এক সময় মানুষ ছিল।"

তার পর তাদের সঙ্গে দেখা একটি ছোটো ছেলের। সে ইস্কুলে যাচ্ছিল।

নেকড়ে প্রশ্ন করল, "ওটা কি মানুষ?"

শেয়াল বলল, "না। তবে একদিন মানুষ হবে।"

শেষটায় এল বনকর্মী। তার কাঁধে দো-নলা বন্দুক; কোমরে ছোরা।

নেকড়েকে শেয়াল বলল, "ঐ দেখো একটা মানুষ আসছে। তুমি ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পার। আমি কিন্তু দৌড়ে আমার গর্তে চললাম।"

নেকড়ে তার দিকে তেড়ে গেল। বন্দুকে বুলেট ভরে নি বলে বনকর্মী মনে মনে আক্ষেপ করে নেকড়ের মুখে ছর্‌রা-ভরা গুলি ছুঁড়ল। ভয়ংকর মুখবিকৃতি করে উঠল নেকড়ে, কিন্তু তবুও ভয় না পেয়ে গেল তেড়ে। বনকর্মী তখন ছুঁড়ল তার দ্বিতীয় গুলি। আবার মুখবিকৃতি করল নেকড়ে। কিন্তু যন্ত্রণা চেপে সে ঝাঁপিয়ে পড়ল বনকর্মীর উপর। বনকর্মী তখন তার ছোরা বার করে তার উপর লাগাল ঘনঘন কোপ বসাতে। ফলে করুণভাবে আর্তনাদ করতে-করতে রক্তাক্ত শরীর নিয়ে নেকড়ে ছুটে ফিরে গেল শেয়ালের গর্তে।

শেয়াল প্রশ্ন করলে, "মানুষের দেখা পেয়ে কেমন লাগল, ভায়া?"

নেকড়ে বলল, "হায় হায়! আমি জানতাম না মানুষদের অমন ক্ষমতা হয়। প্রথমে লোকটা কাঁধ থেকে একটা লাঠি নিয়ে তাতে ফুঁ দেয়, আর কী সব আমার মুখে উড়ে এসে বিশ্রী কামড় বসায়। তার পর আবার সে ফুঁ দেয় তার লাঠিতে আর শিলাবৃষ্টির শিল আর বিদ্যুতের মতো কী সব ছুটে এসে আমার নাকে লাগে। তার পর আমি যখন তার পিঠে সে তখন তার বুকের পাশ থেকে চকচকে একটা পাঁজরা খুলে আমাকে এলোপাথাড়ি কোপাতে থাকে। আমি মরমর হয়ে মাটিতে পড়ে গিয়েছিলাম।"

শেয়াল বলল, "তুমি যে কী রকম মিথ্যে বড়াইকারী এবার বুঝলে তো? আমার কথাটা তোমার শোনা উচিত ছিল। যেটা পার না সেটা করতে যাওয়া বোকামি।"